উপন্যাস-সংগ্রহ

(১২টি উপন্যাস একত্রে)

বাহির হইয়াছে—সেই সর্ব্বজনপ্রিয়

হিরোইন্স বা নায়িকা-লীলাময়ী

উপন্যাস-মালা

(HEROINS)

ইহাতে নিম্নলিখিত ৬টী চমৎকার উপন্যাস আছে ;

১। ফুলজানি বেগম   ২। প্রতিহিংসা

৩। দিলজান বাঁদী   ৪। মাধুরী

৫। গোলাপী   ৬। ফুল

ছয়টী উপন্যাসই অতীব হৃদয়গ্রাহী ; এমন মনোমুগ্ধকর উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে অতীব অল্পই বাহির হইয়াছে, সৌন্দর্য্যে, সৌরভে, রূপে এবং গৌরবে যেন এক একটি ফুটন্ত মল্লিকা—মন প্রাণ বিমোহিত হইবে। এই ছয়খানি মনোরম উপন্যাস একত্রে বাঁধান কেবল নাম মাত্র মূল্য ॥০ আট আনা লইয়া সকলকেই দিব বিলম্বে—পুস্তক ফুরাইলে নিরাশ হইবেন, অদ্যই পত্র লিখুন।

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং,

৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

182 Ud ৭০৭.১৭

182 Od 907 17

উপন্যাস-সংগ্রহ

(দ্বাদশ উপন্যাস)

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল-সম্পাদিত

PAUL BROTHERS & CO.
7, SHIBKRISHNA DAW'S LANE
Jorasanko Calcutta.
1909.

মূল্য ১৷৹ মাত্র।

14. DEC. 10

Published by Paul Brothers & Co.
Shibkrishna Daw's Lane, Joresanko, Calcutta.

PRINTED BY F. C. DAS, "INDIAN PATRIOT PRESS
70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA.

ভূমিকা

বঙ্গসাহিত্যে ইহা এক নূতন উদ্যম। পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে অনেকবার এক-একজন লেখকের ছোট ছোট গল্প একত্র করিয়া বিভিন্ন নামে এক-একখানি উপন্যাস-সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপভাবে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ক্ষুদ্র উপন্যাস একত্র করিয়া কোন পুস্তক অদ্যাপি বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার উপকারিতার পরিচয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ ভাবের কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়া সবিশেষ আদৃত হইয়াছে।

ইহাতে পাঠকগণের একটা সুবিধা আছে, একজন লেখকের গল্পগুলি প্রায় একরূপ ধরণে লিখিত হওয়ায় কেমন একঘেয়ে রকম লাগে; মনে হয়, যেন এক গল্পের চরিত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া অপর গল্পমধ্যে বিচরণ করিতেছে; সেজন্য দুই-একটা গল্প পড়িবার পর পাঠকের আর ধৈর্য্য থাকে না—থাকিলেও আর তত ভাল লাগে না। কিন্তু বিভিন্ন লেখকদিগের বিভিন্ন গল্পাবলী একটার পর আর একটা পাঠে পাঠকের আগ্রহ ও পাঠেচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবারই কথা—তাহা হয়ও।

আমরা স্থির করিয়াছি, এবার হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের যে সকল গল্প সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া উত্তরোত্তর এইরূপ কয়েকখানি উপন্যাস-সংগ্রহ প্রকাশ করিব। এখন পাঠকগণের মনোনীত হইলে আমরা সার্থকশ্রম হইব। তবে বলিয়া রাখি, এবার ইহা আমাদের প্রথম উদ্যোগ—অনেক ত্রুটি থাকিবারই কথা, কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের অন্যান্য সংগ্রহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সেজন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

৬ই বৈশাখ
সন ১৩১৬ সাল

প্রকাশকগণ

সূচিপত্র

উপন্যাস	লেখক	পৃষ্ঠা
১। মানবী না দানবী	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল	১
২। ভীষণ ষড়্যন্ত্র	৺শরচ্চন্দ্র সরকার	২৮
৩। আদর্শ সাক্ষী	ঐ	৬১
৪। রমণী-রহস্য	শ্রীপাঁচকড়ি দে (সঙ্কলক)	৭১
৫। অভাগিনী	৺শরচ্চন্দ্র সরকার	৯৪
৬। কুল-কলঙ্কিনী	ঐ	৯৯
৭। সর্ব্বনাশিনী	শ্রীপাঁচকড়ি দে	১৩১
৮। হীরার কণ্ঠী	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৬৯
৯। বিধির নির্ব্বন্ধ	৺শরচ্চন্দ্র সরকার	১৮৫
১০। শত্রুর কাণ্ড	শ্রীপাঁচকড়ি দে	১৯৭
১১। রাণী দুর্গাবতী	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	২২১
১২। প্রণয়-প্রতিমা	শ্রীপাঁচকড়ি দে	২৪৯

মানবী না দানবী

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি বলিতে চাহি না যে, আমার অতি প্রিয়বন্ধু সুরেন্দ্রভূষণের হঠাৎ মৃত্যু কোন অনৈসর্গিক কারণে ঘটিয়াছে, কারণ আমি জানি, আজি-কালিকার দিনে কেহই সহজে এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। এইজন্য যাহা ঘটিয়াছে, আমি কেবল আনুপূর্ব্বিক বলিতে যাইতেছি। বিশ্বাস করা-না-করা পাঠকদিগের হাত।

সুরেন্দ্রভূষণের সহিত আমি এক সঙ্গে কলেজে পড়িতাম, এক মেসে বাস করিতাম, তাহাই তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিশেষতঃ সুরেন্দ্রের মা ছিলেন না, বাপ পশ্চিমে বড় চাকরী করিতেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সুরেন্দ্রের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না, তিনি মাসে মাসে তাহাকে নিয়মিত পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। আর বড় তাহার কোন সংবাদ লইতেন না।

এইজন্য সুরেন্দ্রের মনেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, সে অতি শীঘ্র নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিত, বড়ই কল্পনা-প্রবণ ছিল। তাহার চোখ দেখিলে বোধ হইত, সে সর্ব্বদাই যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। অথচ সময়ে সময়ে তাহার চক্ষু হইতে

যেন এক অমানুষিক তেজ নির্গত হইত। তখন তাহার মুখ হইতে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ের যেন উৎস ছুটিত।

সে দেখিতে বড় সুপুরুষ ছিল। স্ত্রীলোকে পুরুষের যে চেহারা দেখিলেই ভালবাসে, তাহার তাহাই ছিল, কিন্তু সে কাহারও সহিত বড় মিশিত না, প্রায়ই বাড়ীর বাহির হইত না। অথচ একদিন একজনকে দেখিবামাত্র তাহাকে গভীরতমরূপে ভালবাসিল। আমার সেইদিনের কথা আজও ভালরূপে মনে হইতেছে। আমি ও সুরেন্দ্র এক সময়ে দুইজনে একত্রে তাহাকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিয়া আমার মনে কি ভাব হইয়াছিল, তাহা আমার ঠিক মনে হয় না, তবে আমি সেরূপ সুন্দরী পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ছবিতে অনেক ভাল ভাল সুন্দরী মূর্ত্তি দেখিয়াছি; কিন্তু এমন আর কখনও দেখি নাই—বিশেষ সেই চক্ষু, তেমন সুন্দর—বিশাল—বিলোল চক্ষু আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই।

আমরা সার্কাস দেখিতে গিয়াছিলাম, সেইখানে প্রথমে এই ব্রাহ্মিকা বালিকাকে দেখিয়াছিলাম। বয়স সপ্তদশ বোধ হয় পূর্ণ হয় নাই। যেমন রূপ, তেমনই বেশ, বোধ হইতেছিল, যেন তাহার অলৌকিকরূপে সমস্ত সার্কাস আলোকিত হইয়াছে।

এই বালিকার সহিত একটি যুবক ছিলেন। ইহারা দুইজন আমাদের নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন, আমি সার্কাস না দেখিয়া বঙ্কিমনেত্রে এই অপরূপ বালিকাকে দেখিতেছিলাম। আমি যুবককে চিনিতাম, ইহার নাম জ্যোৎস্নাকুমার। ইনি সম্প্রতি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তাহাই ভাবিলাম যে, নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নার সহিত এই কন্যার বিবাহ হইবে।

মধ্যে জ্যোৎস্না উঠিয়া বাহিরে গেলেন, বালিকা পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল, কিন্তু সে-ও সার্কাস না দেখিয়া—আমি দেখিলাম, সে বরং লোকদিগকেই দেখিতেছে—তবে তাহার দিকে অনেকে যে বিস্মিত ও মুগ্ধভাবে চাহিয়া আছে, তাহা তাহার লক্ষ্য নাই।

আমার বন্ধু সার্কাসের দিকে চাহিয়াছিল, আমি দেখিলাম, বালিকার চক্ষু তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া স্থিরভাবে রহিল। পূর্ব্বে সেই সুন্দর চক্ষু ধীরে ধীরে এদিকে-ওদিকে ঘুরিতেছিল, এক্ষণে তাহা অনিমেষভাবে সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সময়ে সহসা সুরেন্দ্র মুখ ফিরাইল, তাহার চক্ষু বালিকার চক্ষে প্রতিফলিত হইল। বালিকা তখন মুখ ফিরাইয়া লইল, কিন্তু সুরেন্দ্র অতিশয় বিমুগ্ধমাত্র মুগ্ধের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল,, আমি তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, সে সার্কাস সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সার্কাস ভাঙ্গিল, আমরা দুইজনে বাসার দিকে ফিরিলাম। পথে সুরেন্দ্র নীরবে আসিতেছিল। সহসা বলিল, "সেই মেয়েটাকে লক্ষ্য করিয়াছিলে?"

আমি বুঝিলাম, সে কাহার কথা বলিতেছে। তাহাই বলিলাম, "হাঁ, দেখিয়াছি।"

"কে জান? কাহার মেয়ে?"

"না—তাহা জানি না, তবে তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিলে সবই জানিতে পারি। কারণ যাহার সঙ্গে সে ছিলেন, তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

"তিনি কে?"

"ইহার নাম জ্যোৎস্নাকুমার, সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। বোধ হয়, মেয়েটীর সহিত জ্যোৎস্নার বিবাহ হইবে।"

"বিবাহ হইবে!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ কি? বিবাহ না হইলে পরের মেয়ে ইহার সহিত আসিবে কেন? কি সুরেন, মাথা ঘুরে গেছে নাকি?"

সুরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "ঠিক তাহা নহে, তবে স্বীকার করি, আমি এমন আর কখন পূর্ব্বে দেখি নাই। কেবল সুন্দরী বলে নহে, ইহার মুখে কি এক ভাব আছে—তাহা আমি ঠিক বুঝাইতে পারিব না।"

"একেই বলে প্রথম দৃষ্টিতে ভালবাসা। যাহাই হউক, জ্যোৎস্নার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ আছে, তোমার প্রাণের শান্তির জন্য তাহার সঙ্গে দেখা হইলেই ইহার সম্বন্ধে সকলই জানিব।"

তাহার পর অন্য কথা উঠিল। কয়দিন সুরেন বা আমি এই মেয়ের কথা কেহই কিছু বলিলাম না। তবে দেখিলাম, সুরেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষাও যেন অন্যমনস্ক হইয়াছে। সে চিরকালই বেশী কথা কহিত না। এখন যেন আরও নীরব হইয়াছে।

ক্রমে আমি সেই বালিকার কথা একেবারেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই সময়ে একদিন আমার এক বন্ধু আসিয়া বলিল, "ওহে, জ্যোৎস্নার কথা মনে পড়ে?"

আমি বলিলাম, "কোন্ জ্যোৎস্না?"

"বাঃ—এক সঙ্গে পড়িতাম, একেবারে ভুলে গেলে ? লালা ও যে ব্যারিষ্টার হইয়াছে ?"

"হাঁ, চিনি বই কি—তাহার কি হইয়াছে ?"

"তাহার যে ভেঙ্গে গেছে।"

"কি রকম ? শুনেছিলাম নাকি, তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়াছে ?"

"হাঁ, আজ শুনিলাম যে ভেঙ্গে গেছে, যদি লোকেশার যে ভেঙ্গে থাকে, বড় অন্যায়—ললিতা যেমন দেখিতে তেমনই গুণে ?"

"তাহাকে একদিন দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার নাম জানিতাম না—কাহার মেয়ে ?"

"বাপ বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার ছিলেন, মারা গেছেন, কেবল মা আছেন, আর ললিতা তাহার একমাত্র কন্যা, ইহারা বালিগঞ্জে থাকেন, তবে ললিতাকে বড়ই দুর্ভাগিনী বলিতে হয়——"

"দুর্ভাগিনী—কেন ?"

"আর বৎসর ঠিক এই সময়ে বিনয়ভূষণ বলিয়া একজনের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক, এমন সময়ে এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিল।"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "দুর্ঘটনা, সে কি ?"

আমার বন্ধু বলিলেন, "দুর্ঘটনা বলিয়া দুর্ঘটনা, বিনয়ভূষণের মৃত্যু—বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে বিনয়ভূষণ একদিন সন্ধ্যার পর ললিতার বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি অনেক রাত্রে বাড়ী যাইবার জন্য বাহির হন ; সেই পর্য্যন্ত তাহার পর কি হইয়াছিল, তাহা আর কেহ জানে না—দুইদিন পরে এক পড়ো বাগানের পুষ্করিণীতে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়।"

আমি বলিলাম, "আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।"

তিনি বলিলেন, "তাহাই বলিতেছিলাম, আবার বিবাহে গোল হইলে ললিতাকে বিশেষ দুর্ভাগিনী বলিতে হয়। ললিতা বড় ভাল মেয়ে।"

"তোমার সঙ্গে তাহার আলাপ আছে?"

"হাঁ, ললিতার মা সম্পর্কে আমার মাসী—তুমি তাহার সহিত আলাপ করিতে চাও, আলাপ করিলে দেখিবে, এমন ভাল মেয়ে হয় না।"

"আমি তত ব্যস্ত নই, তবে আমার একটি বন্ধু হয় ত আলাপ হইলে খুসী হন। যাহা হউক, এ সময়ে আর নয়, পরে দেখা যাইবে।"

আমার বন্ধু বিদায় হইলেন। আমি ক্রমে আবার ললিতার কথা ভুলিতে আরম্ভ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রায় দুই-তিন মাস পরে আমি একদিন অনেক রাত্রে কোন পীড়িত আত্মীয়ের বাড়ী হইতে বাসায় ফিরিতেছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। আমি সারকুলার রোড দিয়া আসিতেছিলাম, এক মদের দোকানের সম্মুখে কতকগুলি মাতালে হল্লা করিতেছিল, আমি তাহাদের পাশ কাটাইয়া যাইতেছিলাম, এমন সময়ে জঘন্য কোট পেণ্টুলান পরিধান, মাথায় ছেঁড়া টুপী—এক ব্যক্তি আমার হাত ধরিল, সে টলিতেছিল। তাহার মুখ দিয়া মদের

দুর্গন্ধ ছুটিতেছে, আমি বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইতেছিলাম, কিন্তু সহসা গ্যাসের আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম, সে জ্যোৎস্নাকুমার—তাহার এই দশা!

আমি এতই বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, প্রথমে আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কি সর্ব্বনাশ, মানুষের এমন হয়, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, ব্যারিষ্টার—তাহারও এতদূর অধঃপতন হয়, এই সকল মাতাল তাহার সঙ্গী—বন্ধু। আমি অন্ততঃ ইহাই ভাবিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।

আমি বলিলাম, "জ্যোৎস্নাকুমার, সঙ্গে এস।" সে কি অস্পষ্ট স্বরে বলিল, তাহার পর আমার হাত ধরিল। আমি দেখিলাম, তাহার হাত অতিশয় গরম, নিশ্চয়ই তাহার খুব জ্বর হইয়াছে। তাহার পর অস্পষ্টস্বরে সে কি বকিতে লাগিল। আমি তাহার কথা বুঝিতে পারিলাম না, তবে এইটুকু বুঝিলাম, নেশায় এরূপ হয় না, বিকারে লোক যেরূপ বকে, সে সেইরূপ বকিতেছে।

আমি অনেক কষ্টে তাহাকে আমার বাসায় আনিয়া শোয়াইয়া দিলাম। সে অর্দ্ধ নিদ্রিত হইল, তাহাকে এই ঘরে রাখিয়া আমি অন্য ঘরে শয়ন করিব বলিয়া পা টিপিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সে উন্মত্তের ন্যায় আমার হাত ধরিল। বলিল, "যেও না—যেও না—তুমি থাক—তুমি থাক—তা হলে সে কিছু করতে পারবে না।"

আমি বলিলাম, "কে সে? কাহার ভয় করিতেছ?"

সে বিকটস্বরে বলিল, "সেই—সেই—সে—চেন না—জান না—সুন্দরী—রাক্ষসী——"

আমি বলিলাম, "তোমার জ্বর হইয়াছে। ঘুমাও—ঘুমাইলে সুস্থ হইবে।"

সে অস্পষ্টস্বরে বলিল, "ঘুমাইব—কেমন করে—কেমন করে? ঐ—ঐ—ঐ বিছানায় বসে আছে, ঐ তার সেই চোখ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—ঐ—ঐ—ঐ—এইজন্যই মদ খাই—ভোল্‌বার জন্যে মদ খাই—তার হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য মদ খাই—ঐ—ঐ।"

আমি তাহার কপালে খানিকটা ওডিকলন দিয়া বলিলাম, "জ্যোৎস্নাকুমার, তোমার অসুখ হইয়াছে, তুমি কি বলিতেছ, তাহা তুমি জান না, স্থির হয়ে——"

সে আমায় প্রতিবন্ধক দিয়া বলিল, "আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আমি জানি—খুব জানি—আমি নিজে ইচ্ছে করেই এ বিপদ্ এনেছি—না—না—না—তা পার্‌ব না।"

জ্যোৎস্না কিয়ৎক্ষণ নীরবে শয্যায় পড়িয়া রহিল। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "আগে—আগে সে আমায় বলে নাই কেন, আমি তাকে প্রাণের সঙ্গে যখন ভালবাসিলাম, তখন সে আমার এ সর্ব্বনাশ করিল কেন?"

সে পুনঃপুনঃ আপন মনে এই কথা বলিতে লাগিল, তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন আমিও গিয়া শয়ন করিলাম। তাহার কথা আমার কানে যেন ধ্বনিত হইতে লাগিল, জ্যোৎস্নার সে যে কে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব রহিল না, এ সকল কি, এ কি ভয়াবহ রহস্য! আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলাম না, বিছানায়

পড়িয়া এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম, বোধ হয়, ভোর রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন সুরেন্দ্র আসিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইল, তখন প্রায় নয়টা বাজে।

আমি উঠিয়াই জ্যোৎস্নার সন্ধান করিলাম, সে আমার গৃহে নাই, আমি অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিয়াছিলাম, তখন সকলেই ঘুমাইতেছিল, কেহ আমাদের বাসায় আসিতে দেখে নাই। সুতরাং জ্যোৎস্না যে আমার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাও কেহ জানিত না, সে কখন যে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাও কেহ দেখে নাই।

আমি বিস্মিত হইলাম, ভীত হইলাম, উদ্বিগ্ন হইলাম, কিন্তু সকল কথা কাহাকেও বলা উচিত বিবেচনা করিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে কার্য্যোপলক্ষে আমায় দেশে যাইতে হইল। কাজ মিটাইয়া কলিকাতায় ফিরিতে আমার প্রায় চারি মাস অতীত হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া সুরেন্দ্রের অন্য মূর্ত্তি দেখিলাম, সে আর নীরব, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক সুরেন নাই, সর্ব্বদাই হাসি—স্ফূর্ত্তি।

আমি আসিবামাত্র সে বলিল, "একটা নূতন সংবাদ আছে।"

"নূতন সংবাদ—কি সংবাদ হে ?"

"আমার বিবাহ।"

"বিবাহ, ভালই ত—সুখের বিষয়—আনন্দের বিষয়—কোথায় ? কাহার সঙ্গে ?"

"সে শুনিলে আশ্চর্য্য হবে ?"

"কেন ? তাহাতে আশ্চর্য্য হইব কেন ?"

"সার্কাসে যে মেয়েকে দেখেছিলে, মনে পড়ে ?"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "কে—কে ?" আমার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল ! স্বরেন বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "কেন—কি হইয়াছে ?"

আমি বলিলাম, "তার সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির হয়েছে ?"

"হাঁ, তেমন আর আছে ? তবে ব্রাহ্ম—আমিও তাই চাই।"

আমি আমার মনোভাব অতি কষ্টে গোপন করিলাম। সুরেন্দ্র বলিল, "আমি ইহার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই, সত্য কথা বলিতে কি বোধ হয়, আমার মত সুখী আর কেহ নাই। তুমি তাহাকে চেন না, আজই তোমার সঙ্গে তাহার আলাপ করিয়া দিব। তখন তুমি বুঝিবে যে, এমন চমৎকার স্বভাব বড় একটা দেখা যায় না।"

আমি আমার মনের ভাব মনে লুকাইয়া সুরেন্দ্রের সম্মুখে তাহার বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিলাম, কিন্তু আমার মনে তাহার জন্য ভয় হইল, কেন হইল, তাহা নিজেই ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কেমন এই বালিকা সম্বন্ধে আমার মনে একরূপ সন্দেহ ও ভয় হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ জ্যোৎস্নার কথা মনে উদিত হইতে লাগিল। দুইজনের সহিত এই বালিকার পূর্ব্বে বিবাহ স্থির হইয়াছিল। একজন বিবাহের অতি পূর্ব্বে অজ্ঞাতরূপে হত হইয়াছে। অপরের মৃত্যু না হইলেও তাহার যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তেমন্ আর কাহারও হয় না, এখন ভগবান্ জানেন, আমার এ বন্ধুরও অদৃষ্টে কি আছে !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে সুরেন আমাকে ললিতার নিকট লইয়া চলিল। তাহার বাড়ীর নিকট আসিলে আমার স্মরণ হয়, আমরা একটা কুকুরের বিকট ডাক শুনিতে পাইলাম ; পরে বুঝিলাম যে, সে শব্দ ললিতাদের বাড়ীর ভিতর হইতেই উত্থিত হইতেছিল।

আমরা তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাহার জননী আমাদের বিশেষ আদর করিয়া বসাইলেন। আমি দেখিলাম, ললিতা যেন পূর্ব্বাপেক্ষাও সুন্দরী হইয়াছে, ইহাকে দেখিবামাত্রই যে লোকে মুগ্ধ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুমাত্র ছিল না।

ললিতা একগাছা ছড়ী লইয়া তাহার ক্ষুদ্র কুকুরকে শাসন করিতেছিল। কুকুরটা ভয়ে জড়সড় হইয়া কাতরভাবে চীৎকার করিতেছিল। আমি বুঝিলাম, ললিতা শাসন করিতেও জানে।

আমার বন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "ললিতা দেখিতেছি, তোমার কুকুর আবার কিছু দোষ করিয়াছে।"

ললিতা অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার মেরি খুব ভাল কুকুর, কিন্তু মাঝে মাঝে বড়ই বজ্জাতি করে, তাহাই ইহাকে মাঝে মাঝে শাসন না করিলে চলে না। মানুষের বেলায় এইরূপ হইলে ভাল হয় নাকি ? কি বলেন আপনি ?"

আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। সুরেন্দ্রনাথ বলিল, "ললিতা, আজ তুমি দেখিতেছি, ভীমামূর্ত্তি ধরিয়াছ।"

সে হাসিয়া বলিল, "না, কেবল তোমার বন্ধুর মতামত চাহিতেছিলাম।"

তাহার পর তাহারা দুইজনে নানা কথা কহিতে লাগিল, আমি নীরবে বসিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিলাম।

ললিতার মা বৃদ্ধা হইয়াছেন, সহসা তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয়, যেন সে মুখে আদৌ রক্ত নাই। যেন মুখ মোমে গড়া, আমি অন্য কাহারই এরূপ মুখ আর কখনও দেখি নাই। তিনি নীরবে বসিয়া কি একটা সেলাই করিতেছিলেন, আমরা উপস্থিত হইলে প্রায় আদৌ কথা কহেন নাই। আমি চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার শরীর এখন কেমন? শুনিয়াছিলাম, আপনার অসুখ হইয়াছিল।"

তিনি আমার কথায় চমকিত হইয়া আমার মুখের দিকে কেমন একভাবে চাহিলেন—তখন আমি দেখিলাম, তাঁহার মুখে ভয়—অতি ভয়াবহ ভয়ের ভাব স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা এত স্পষ্ট যে, দেখিলেই মনে হয়, এই স্ত্রীলোক জীবনের কোন-না-কোন সময়ে কোন কারণে বিশেষ ভয় পাইয়াছিলেন। অথবা কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এখন ভাল—এখন বেশ আছি।"

তিনি সভয়ে কন্যার দিকে চাহিলেন, তখনও ললিতা ও সুরেন্দ্র মৃদুস্বরে উভয়ে কথোপকথন করিতেছিল। সহসা তিনি আমার দিকে ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না। আমার মেয়ে ইহা পছন্দ করে না, কথা কহিলে পরে আমাকে ভুগিতে হইবে—কথা কহিবেন না।"

বলাবাহুল্য, তাঁহার এই কথায় আমি বিশেষ বিস্মিত হইলাম। এরূপ বলিবার অর্থ কি তাহাই আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে

যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি সহসা উঠিয়া পাশের দ্বার দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাওয়ায় আমি ললিতার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, সে কথা বন্ধ করিয়া তীব্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেছে।

আমাকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সে বলিল, "আমার মার শরীর ভাল নয়, বেশী কথা কহিতে পারেন না, আসুন এই সব ছবি দেখুন।"

আমরা তিনজনে কিয়ৎক্ষণ ছবি দেখিলাম। যতই আমি এই স্ত্রীলোককে দেখিতে লাগিলাম, ততই ইহার কোন ভাব না বুঝিতে পারিলাম। একদিকে বোধ হয় এই স্ত্রীলোক আদৌ নারী নহে, একজন মহা বলবান্ পুরুষ, অপরদিকে বোধ হয়, স্ত্রীলোক হইতেও কোমলা সরলা স্ত্রীলোক। কিয়ৎক্ষণ আমরা আরও ললিতার বাড়ী কাটাইয়া তথা হইতে বাহির হইলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, "ললিতাদের কেমন দেখিলে?"

আমি সাবধানে বলিলাম, "নিশ্চয়ই অতিশয় ভদ্র।"

"ও—তাহা ত তুমি না দেখিয়াও বলিতে পারিতে। কি বুঝিলে?"

"নিশ্চয়ই অতিশয় বুদ্ধিমতী।"

সুরেন্দ্র আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নীরবে চলিল।

আবার বহুদূর আসিয়া সে সহসা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি মনে কর—সে নিষ্ঠুর?"

আমি তাহার এই অদ্ভুত প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমি কেবল আজ তাহাকে দেখিলাম, কিরূপে তোমার এ কথার উত্তর দিব?"

আবার আমরা দুইজনে বহুক্ষণ নীরবে চলিলাম, তাহার পর সুরেন্দ্র সহসা বলিয়া উঠিল, "আর তাঁহার কথা—সম্পূর্ণ পাগল—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে পাগল?"

সুরেন্দ্র বলিল, "ললিতার মা।"

আমি কোন কথা কহিলাম না, বুঝিলাম, ললিতার মা কিছু-না-কিছু আমার বন্ধুকে বলিয়াছে। আমি ভাবিলাম, ললিতার মা কি বলিয়াছে, তাহা সে নিজেই বলিবে; কিন্তু সে কোন কথা কহিল না, আমরা নীরবে দুইজনে বাসায় উপস্থিত হইলাম।

সুরেন্দ্র সেদিন সকালে সকালে শুইয়া পড়িল। কিন্তু আমি কিছুতেই নিদ্রিত হইতে পারিলাম না, পুনঃ পুনঃ আমার ললিতার কথা মনে হইতে লাগিল। এই বালিকার সহিত যে কোন গূঢ় ও ভয়াবহ রহস্য জড়িত আছে, ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। তাহার সহিত যাহার প্রথম বিবাহ স্থির হইয়াছিল, তাহার রহস্য-ময় মৃত্যু—তাহার পর জ্যোৎস্নাকুমারের অধঃপতন। সে বলিয়াছিল, "কেন সে আগে আমায় বলে নাই," তাহার পর ললিতার মা আমাকে যাহা বলিয়াছিল, সুরেন যাহা পথে বলিল, এমন কি ললিতার কুকুরকে প্রহার করা পর্য্যন্ত সমস্তই আমার মনে একে একে উদিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, আমার মন বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। এই বালিকার প্রতি কেমন এক ঘৃণার ভাব আসিল, অথচ আমি ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু তবুও আমার বন্ধুকে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু কি বলিব। যদিই বা কিছু বলি, আমি জানিতাম, সুরেন আমার কথায় বিন্দুমাত্র কাণ দিবে না।

যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি স্থির করিলাম, এই বালিকা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিব। বিশেষ ইহার পিতা কিরূপ লোক ছিলেন, তাহা অবগত হওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য। আমার বন্ধুর জন্য আমার এ সকল অনুসন্ধান করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল স্থির করিয়া আমি নিদ্রিত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনেক অনুসন্ধানের পর ললিতার পিতার এক বাল্যবন্ধুকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলাম। দেখিলাম, তিনি আমার আত্মীয় —আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

ললিতার সহিত আমার একটি বিশেষ বন্ধুর বিবাহ হইতেছে বলিয়া তাঁহাকে তাহার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "বড় ভাল লোক ছিলেন, তবে লেখাপড়া শিখে বিলেত গিয়েও তিনি মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস করিতেন, অনেক সময়ে এই রকম যাদু-বিদ্যার আলোচনা করিতেন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে কোন লোকের দেহ ও মনের উপর যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে; আমরা এ সকল বিশ্বাস করিতাম না, তাহাই তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।"

আমি ললিতার পিতা সম্বন্ধে এই কথা শুনিয়া ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম। তবে কি ললিতা পিতার নিকট হইতে এই শক্তি পাইয়াছে। তখনই আমার মনে তাহার সেই

চক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রতিফলিত হইল, কি বিশ্বাস করিব, কি বিশ্বাস না করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

এই সময়ে কলিকাতায় একজন বিখ্যাত যাদুকর আসিয়াছিলেন। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ইহা কি সত্য যে, একজন লোক অপরের দেহ ও মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে?"

"হাঁ, যদি তাহার ইচ্ছাশক্তি অতি প্রবলা থাকে।"

"দূর হইতেও কি সে এই শক্তি অন্যের উপর আরোপ করিতে পারে?"

"নিশ্চয়ই। বহুদূর হইতেও পারে।"

"তাহা হইলে এরূপ লোক ত অনেক অনিষ্টসাধন করিতে পারে?"

"পারেই ত।"

আমি অতিশয় চিন্তিত হইয়া গৃহে ফিরিলাম। তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, সুবিধা পাইলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, ললিতার যথার্থই এই শক্তি আছে কিনা।

একদিন সে সুবিধা ঘটিল। আমাকে সুরেন্দ্র ললিতার বাড়ী একদিন লইয়া গেল। তাহার পর কোন কাজে বাহিরে যাইতে বাধ্য হওয়ায় আমি সুবিধা পাইয়া আমার উদ্দেশ্যপূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইলাম।

কথায় কথায় সেই যাদুকরের কথা তুলিয়া বলিলাম, "আমার বোধ হয়, আপনার এই শক্তি আছে।"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "আপনি দেখিতেছি, আমাকে খুব উচ্চে তুলিয়াছেন—আপনার কি অদ্ভুত ধারণা হইয়াছে।"

আমি তাহার কথায় কান না দিয়া বলিলাম, "এ ক্ষমতা বিপজ্জনক সন্দেহ নাই।"

সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কেন?"

"যাহার এ রকম ক্ষমতা আছে, সে এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারে।"

"তাহা হইলে আপনি আমাকে একজন ভয়ানক ডাইনী স্থির করিয়াছেন দেখিতেছি। আমি জানি, আপনি আমাকে দেখিতে পারেন না। আপনি আমায় অবিশ্বাস করেন—সন্দেহ করেন।"

আমি তাহার এই কথায় কি উত্তর দিব, স্থির করিতে পারিলাম না। সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখুন, আপনার মিথ্যা ধারণার উপর নির্ভর করিয়া আমার সম্বন্ধে আপনার বন্ধুকে কিছু বলিবেন না, আপনার জন্য যদি আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন মনোমালিন্য ঘটে, তাহা হইলে জানিবেন, আপনারও ভাল হইবে না।"

এ যে স্পষ্ট শাসানি—আমি বলিলাম, "আমি আমার বন্ধুর অভিভাবক নহি, তবে আমি যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বলিতেছি, আমার বন্ধুর জন্য বড় আমার ভয় হয়।"

ঘৃণার সহিত সে বলিল, "ভয়, মহাশয় কি দেখিয়াছেন—শুনিয়াছেন? বোধ হয়, জ্যোৎস্নার কাছে শুনিয়াছেন, সে-ও আপনার একজন বন্ধু বটে?"

আমি বলিলাম, "তিনি আপনার নাম আমার কাছে করেন নাই। যাহাই হউক, বোধ হয়, আপনি শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, জ্যোৎস্না বাবু মৃত্যু-শয্যায়।"

আমার কথায় তাহার মনের কি ভাব হয়, তাহাই দেখিবার জন্য তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলাম, কি ভয়ানক, আমি স্পষ্ট বুঝিলাম যে, সে এই কথায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া মনে মনে হাসিতেছে। তাহার মুখে যে আনন্দ খেলিতেছে, তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। ইহাতে আমার মনে যে কি ভাব হইল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, আমার মনে পূর্ব্বে যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, এক্ষণে তাহা দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হইল।

আমি আসিবার সময় সে এমনই ভাবে আমার দিকে চাহিল যে, আমি স্পষ্ট বুঝিলাম যে, আমাকে শাসাইতেছে; কিন্তু তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি বেশ জানিতাম, আমি কোন কথা বলিলেও সে শুনিবে না।

কয়দিন আমি কি করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; কিন্তু অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে নীরব থাকিতে হইল। আর অধিক কিছু বলিবার নাই। যাহা এক সময়ে অনুমান সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষয় ছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ বিশ্বাসে পরিণত হইল।

এক্ষণে আমি আমার বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যুর কথা বর্ণন করিতে যাইতেছি। যাহা ঘটিয়াছে, ঠিক তাহাই লিখিতেছি, ইহার এক বিন্দুও বাড়াইয়া লিখিতেছি না।

কয়েকদিন পরে সুরেন আমাকে বলিল, "ভাই, আর রবিবারে আমার বিবাহ স্থির করিয়াছি। ললিতা আজ রাত্রি দশটার সময় দেখা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছে—অসময় বটে, কিন্তু বোধ হয়, বিশেষ কোন কথা আছে। মা ঘুমাইলে বোধ হয়, কোন বিশেষ কথা বলিতে ইচ্ছা করে।"

আমার বন্ধু চলিয়া গেলে সহসা আমার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। ললিতার সহিত প্রথমে যাহার বিবাহের কথা হয়, সেও তাহার সহিত রাত্রে দেখা করিয়াছিল, তাহার পরই তাহার মৃত-দেহ পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার জোৎস্নার কথা মনে পড়িল, আমি কেবল সেইদিন শুনিয়াছিলাম যে, হতভাগা জোৎস্না মারা গিয়াছে।

এই সকলের অর্থ কি? এই স্ত্রীলোকের কি বিবাহের পূর্ব্বে কোন ভয়াবহ কথা ভাবী স্বামীকে বলিবার আছে? এইজন্যই কি তাহার এতদিন বিবাহ হয় নাই? এইজন্যই কি সে কথা শুনিবামাত্র কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় না? আমি পুনঃ পুনঃ মনে মনে শতবার এই সকল প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। আমার হৃদয় ঘোর সন্দেহে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার বন্ধুর জন্য ভয়ে আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

আমার বন্ধুকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু সে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইবার উপায় নাই। সে কোনদিকে কোনপথে গিয়াছে, তাহা জানি না, ললিতার বাড়ী আমি কিরূপে এত রাত্রে যাইব। আমি পাগলের ন্যায় বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বারটা বাজিল। সাড়ে বারটা বাজিল, পরে একটা বাজে—এই সময়ে কে দরজায় ঘা মারিল, আমি সত্বর দরজা খুলিতে ছুটিলাম। দেখি, দ্বারে অবসন্নভাবে সুরেন্দ্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে—তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে।

সুরেন্দ্র প্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, আমি না ধরিলে সে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত। আমি অতি কষ্টে তাহাকে ধরিয়া লইয়া আমার ঘরে আনিলাম, সে বিছানায় বসিয়া পড়িল। তখন আমি আলোকে তাহার মুখ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তাহার মুখে বিন্দুমাত্র রক্ত নাই, দেখিলে মৃতব্যক্তির মুখ বলিয়া বোধ হয়, তাহাব ওষ্ঠ নীল হইয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষুতে তেজ নাই, কোন ভয়াবহ কিছু সংঘটিত না হইলে কাহাবই এ অবস্থা হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুরেন, একি—কি হইয়াছে—তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

সে বহুক্ষণ কোন উত্তর দিল না, আমি বুঝিলাম, সে প্রকৃতিস্থ [illegible]ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছে। আমি তাহাই তাহাকে আর কোনরূপে বিরক্ত করিলাম না, সে যাহাতে প্রকৃতিস্থ হয়, তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিলাম।

বহুক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে সমস্ত চুকিয়া-বুকিয়া গিয়াছে।"

আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "এরূপ নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নহে। এমন করিও না, কি হইয়াছে ধীরভাবে বল।"

"কি হইয়াছে?"

আমার বোধ হইল, এই কয়টি কথা বলিতে যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বহুক্ষণ আবার নীরব থাকিয়া সে বলিল, "যদি আমি তোমায় সব বলি, তুমি বিশ্বাস করিবে না, সে ভয়ঙ্কর—ভয়াবহ—বর্ণনার অতীত। ও: ললিতা—কুহকিনী ললিতা——"

সে পাগলের ন্যায় মস্তক চালিতে লাগিল। তাহার পর কম্প-কণ্ঠে উদ্দেশে বলিল, "আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি দেবী, এখন দেখিতেছি, তুমি——"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "তুমি কি ?"

সুরেন্দ্র শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে গর্জ্জিয়া বলিল, "কি—কি—শুনিতে চাও ? রাক্ষসী—রাক্ষসী—রাক্ষসী—না না—আমার বলা উচিত নহে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম, এখনও বড় ভালবাসি।"

সে হতাশভাবে শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া নীরবে রহিল, আমি ভাবিলাম, সে ঘুমাইয়াছে। কিন্তু সে সহসা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কখনও ডাইনীর কথা শুনিয়াছ ?"

আমি বলিলাম, "শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কখনও দেখি নাই।"

সে কাতরে বলিল, "হাঁ—হাঁ—হাঁ—আছে—আছে—আছে—না, না—তাহা পারিব না—বরং মৃত্যু ভাল—ভাল—ভাল।"

এইরূপ অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে সে অবশেষে নিদ্রিত হইল। আমিও শয়ন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পর দিবস তাহার ভয়ানক জ্বর হইল। প্রায় দুই মাস তাহার জীবন অতি সঙ্কটাপন্ন রহিল। আমি ভাল ভাল ডাক্তার আনিয়া তাহার চিকিৎসা করিলাম। বিকারে বিকারে সে সর্ব্বদাই অস্পষ্ট স্বরে নানা প্রলাপ বকিত। কখন বলিত, "না—না—আমি তাহাকে যে প্রাণের সহিত ভালবাসি।" আবার কখনও চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিত, "রাক্ষসী—ডাকিনী—প্রেতিনী ?"

প্রায় দুইমাস পরে সুরেন আরোগ্য হইল। তখন সে আর পূর্ব্বের সুরেন্দ্র নাই—সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়াছে। সে কখনও খুব প্রফুল্লিত থাকে, কখনও বা এত গম্ভীর হয় যে, কাহারও সহিত কথা কহে না। কখনও কখনও সে চমকাইয়া উঠে, বোধ হয়, যেন কি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।

কিন্তু রোগ হইতে উঠিয়া সে একদিনও ললিতার নাম করে নাই। আমিও পাছে সে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া উত্তেজিত হয় বলিয়া তাহার নাম তাহার নিকটে বলি নাই।

বায়ু-পরিবর্ত্তনে তাহার দেহ মন দুই সবল হইবে ভাবিয়া আমি তাহাকে অনেক বলিয়া-কহিয়া সঙ্গে করিয়া দার্জ্জিলিংয়ে লইয়া গেলাম। কিন্তু সুরেন্দ্র সহরে লোকালয়ে বাস করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইল। আমি অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না, তখন আমি দার্জ্জিলিংএর নিকট সোনাদা নামক স্থানে পাহাড়ের এক অতি নির্জ্জন স্থানে একটি ছোট কাঠের বাড়ী পাইয়া তাহাকে লইয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিলাম।

ইহার নিকটে লোকালয় ছিল না। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই রবিবারে রবিবারে দার্জ্জিলিংএর হাট হইতে কিনিয়া আনিতে হইত, আমি বন্ধুকে ছাড়িয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম না। তাহাই যে ভুটিয়া চাকরকে রাখিয়াছিলাম, তাহাকেই হাটে পাঠাইতাম।

এই স্থান অতি নির্জ্জন বলিয়া আমার ভাল লাগিত না। কিন্তু আমি দেখিলাম, এই নির্জ্জনতার জন্যই সুরেন্দ্র এই স্থান খুব পছন্দ করিল। সে সমস্ত দিনই প্রায় বাহিরে বসিয়া পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘের খেলা দেখিত, দেখিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিত। তাহার মুখে যে ভয়ের ভাব ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বিলীনতাপ্রাপ্ত হইল, তাহার দেহও দিন দিন সবল হইয়া আসিল, তাহার যে ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাও দূর হইয়া, অনেকটা সে তাহার পূর্ব্ব ভাব, স্বভাব, পূর্ব্ব দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাতে আমি হৃদয়ে বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম।

একদিন রাত্রে আমরা দুইজনে আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরের বাহিরে বসিয়াছিলাম, সেদিন তত শীত ছিল না। বিশেষতঃ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল না, এ পাহাড়ে এ দৃশ্য অতি নূতন, তাহাই প্রকৃতির সেই মনোবিমোহন সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য আসিলাম।

সেদিনের—সে রাত্রের প্রতি কথা সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

আমি নিজ মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলাম, সহসা সুরেন্দ্র লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখ ভয়াবহভাবে

বিকৃত হইয়াছে, সহসা কোন অভাবনীয় ভীতিব্যঞ্জক দৃশ্য দেখিলে লোকের এইরূপ মুখভাব হয়। তাহার দৃষ্টি অচঞ্চল, বিস্ফারিত, তাহার মুখ কঠোর—সম্পূর্ণ রক্তশূন্য। সে তাহার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "দেখ—দেখ—দেখ—ঐ যে সে—ঐ যে সে—ঐ দেখিতেছ না, ঐ পাহাড় পথ দিয়া নামিয়া আসিতেছে।"

এই বলিয়া সে সভয়ে আমাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল।

আমি অন্ধকারে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "কে—কে ?"

সুরেন্দ্র আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "সেই—সেই—সে—সেই সে—ললিতা—ললিতা। সে আমাকে লইতে আসিয়াছে—তুমি আমার আজীবনের বন্ধু, জোর করিয়া ধরিয়া রাখ—আমায় যাইতে দিও না।"

আমি তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "কই কি—তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ—ছেলে মানুষি করিও না। মানুষকে এত কিসের ভয় ?"

সে হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, "না, গেছে—গেছে—চলে গেছে।"

ক্ষণপরেই আবার বলিয়া উঠিল, "না, না ঐ যে আসছে—ঐ যে আস্‌ছে, ঐ যে আরও কাছে এসেছে। ঐ যে আরও কাছে—ওঃ—ওঃ—ওঃ—সে বলেছিল, সে আসবে—আমায় নিতে আসবে—তাই এসেছে—এসেছে—এসেছে——"

আমি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলাম, "এস ঘরের ভিতর যাই।"

তখন তাহার হাত বরফ হইতেও শীতল হইয়া গিয়াছে।

সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি জানি—জানি জানি—সে আমায় ডাকবে, আমায় যেতে হবে—যেতে হবে—যাবো। তুমি আমায় আর রাখতে পারবে না। যাচ্ছি—যাচ্ছি পাতকী—কলঙ্কিনী যাচ্ছি—যাচ্ছি।"

সহসা সে আমার হাত দূরে সবলে নিক্ষেপ করিয়া তীরবেগে অন্ধকার-পথে ছুটিল। আমিও "দাঁড়াও—দাঁড়াও—কর কি সুরেন—সুরেন—সুরেন," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। কিন্তু পাহাড়-পথে ছুটিয়া যাওয়া সহজ কার্য্য নহে। আমি অন্ধকারে ভাল দেখিতেও পাইতেছিলাম না, তবে এইমাত্র বুঝিলাম, সুরেন্দ্র আমার আগে আগে যেন একটা স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে—আরও যেন আমার মনে হইল, যেন কি এক ছায়ামূর্ত্তি তাহার হাত এড়াইয়া তাহার আগে আগে যাইতেছে, সে তাহা ধরিবার চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিতেছে না। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। সে এক পাহাড় পার হইয়া আমার দৃষ্টির বাহির হইল, যখন আমি পাহাড় ঘুরিলাম, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। চারিদিকে অনেক অনুসন্ধান করিলাম, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই শেষ দেখা।

আমি লণ্ঠন লইয়া নিকটস্থ কুটিয়াদিগের বাড়ী হইতে অনেক লোক সঙ্গে আনিলাম। তাহার পর আমরা চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সুরেনের অনুসন্ধান করিলাম, শেষে একটা কারণে অনুসন্ধান নিরস্ত করিতে হইল।

সহসা পাহাড়ের পার্শ্বে শব্দে এক ভয়াবহ বিকট ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত হইল; আমার বোধ হইল যেন, কোন আলোক অদৃশ্য

করিতেছে। এই শব্দ শুনিয়া পাহাড়িয়াগণ উর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের দিকে ছুটিল, আমিও অগত্যা কুটীরে ফিরিলাম। এরূপ ভয়াবহ হাস্য-ধ্বনি জীবনে আর কখনও শুনি নাই, শুনিবার ইচ্ছাও করি না।

আমার বন্ধুর মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। তাহার এক কথাও বাড়াইয়া বলি নাই। তবে অনেকে ভাবি-বেন; ইহাতে নূতন কিছু নাই, সহসা লোকটা পাগল হইয়া গিয়া খাদে পড়িয়া মরিয়াছে। খবরের কাগজে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও এখানে তুলিলাম ;—

"অপঘাত মৃত্যু। গত রবিবারে সোনাদার নিকট এক অতি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কলিকাতায় একজন সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র সুরেন্দ্র বাবু শরীর শোধরাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুর সহিত সোনা-দায় বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি সঙ্কটাপন্ন রোগ হইতে উঠিয়াছিলেন, অনুসন্ধানে জানা গেল, এই পীড়ার জন্য তাঁহার মস্তিষ্কও বিকৃত হইয়াছিল। সহসা রবিবার সন্ধ্যার পর তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেয়, হঠাৎ বন্ধুর নিকট হইতে ছুটিয়া অন্ধ-কারে পাহাড় পথে যান, তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই। দুইদিন পরে তাঁহার মৃতদেহ প্রায় পাঁচ শত হাত নিম্নে পাহাড়ের খাদের নিম্নে পাওয়া গিয়াছে—বড়ই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।"

* * * * *

আমার আর কিছু বলিবার নাই, আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম। আমি জানি, অনেকে বলিবেন, ইহাতে ললিতার অপরাধ কি ? যদি কেহ উন্মাদ হইয়া যাহা-তাহা বলে বা করে, পরে—অবশেষে ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুমুখে যায়, তাহা হইলে অপরের

তাহাতে অপরাধ কি? যাহারা এ কথা বলিলেন, তাঁহাদের সহিত আমার কলহ নাই, তবে আমি জানি, এই সুন্দরী কুহকিনী ললিতা তিনজনকে ইচ্ছা করিয়া হত্যা করিয়াছে — প্রথম তাহার সর্ব্বপ্রথম ভাবি স্বামী, দ্বিতীয় জ্যোৎস্নাকুমার—তৃতীয় সুরেন্দ্র ভূষণ।

উহার বিশেষ কোন প্রমাণ দিতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস, ডাইনী বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে এই অপ্সরীরূপা ললিতা—সেই ডাইনী। মানুষের রক্তপানেই তাহার আনন্দ। এরূপ জীব যে আছে, আর হয়, তাহা আমি বিশ্বাস করি। ইহা-দের ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল যে, ইহারা অপরকে অনায়াসে দাসানু-দাস করিতে পারে, তাহাকে রাখিতেও পারে, মারিতেও পারে।

আমি ললিতাকে আর তাহার পর দেখি নাই—দেখিতেও ইচ্ছা করি না। তাহার কি হইয়াছে, সে এখন কোথায় আছে, তাহাও আমি জানি না।

কিরূপে ভদ্রকন্যা—এমন সুন্দরী, এমন সুশিক্ষিতা — যে এরূপ ভয়ঙ্করী রাক্ষসী হইল, তাহাও আমি জানি না; বিবাহের পূর্ব রাত্রে তাহার ভাবী স্বামীকে সে যে কি ভয়াবহ কথা বলিল, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন।

সত্য ঘটনা বলিলাম, এই ক্ষুদ্র বিবরণ পাঠ করিয়া যদি কেহ এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক হইবে।

সমাপ্ত।

ভীষণ ষড়যন্ত্র

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

সূচনা

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার একটি পুত্র হয়। যখন পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন বৃদ্ধ রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি প্রধান মন্ত্রীকে নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া আপন শিশু-পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অনেক কথা বলিয়া যান।

প্রধান মন্ত্রী কিন্তু বড়ই কূটবুদ্ধি। শূন্য-সিংহাসন তাঁহার করতলগত জানিয়াও রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি তাহা অধিকার করিতে যত্নবান্ হয়েন নাই। রাজার মৃত্যু হইল, তাঁহার যথাবিধি সৎকার করাও হইল। জানিয়া-শুনিয়াও তথাপি সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রীবর সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিলেন না। বরং তিনি রাজ্যমধ্যে প্রচার করিলেন যে, "এতদিন পরে যদিও আমরা পিতৃহীন হইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের সিংহাসন শূন্য হয় নাই। আমরা শিশু-রাজকুমারের উদ্দেশে 'রাজ্যে রাজা বর্ত্তমান' জ্ঞানে মন্ত্রীসমাজ গঠিত করিয়া যথারীতি রাজ্য পরিচালন করিব। পরে কুমার বয়স্থ হইলেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে প্রতি-

ষিক্ত করিয়া আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইব।” এই ঘোষণায় প্রজাবর্গ অতিমাত্র প্রীত হইল; রাজকার্য্যও অতি সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল।

অল্প দিনের মধ্যেই মন্ত্রীর রাজ্যশাসনগুণে প্রজাবর্গ বশীভূত হইল; সেনাপতি, অপরাপর মন্ত্রীবর্গ রাজ্যের শিরোভূষণ গণ্যমান্যজনগণ সকলেই নৃপতির মৃত্যুজনিত শোক ভুলিয়া গিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার একেবারেই তিরোহিত হইল। সকলেরই এই ধারণা হইল যে, “এমন সুখে কখনও কোন দেশের প্রজাবর্গ জীবনযাপন করিতে পারে না।”

এতদিনে মন্ত্রী আপনার সময় বুঝিলেন। তিনি দেখিলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ; প্রজাগণ সকলেই সুখী; অমাত্যবর্গ কেহই তাঁহার কৌশল বুঝিতে পারেন নাই। বরং সকলেই তাঁহাকে বড় উদারচেতা বলিয়া বিশ্বাস করেন; সেনাপতি তাঁহার কথায় অঘটন সংঘটন করিতে অগ্রসর; রাজ্যের পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার জয়গানে তৎপর। তখন তিনি আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

রাজনীতিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রীবর চারিদিক সুবিধাজনক দেখিয়াও শিশু রাজকুমারকে তাঁহার উচ্চ আশার পথে প্রধান অন্তরায় এবং কণ্টকস্বরূপ জ্ঞানে তাহাকে কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রে সে পথ হইতে সরাইয়া নিষ্কণ্টক হইবার বাসনা করিলেন। কুচক্রীর কুচক্রের অভাব কি? মনে মনে নানাপ্রকার অভিসন্ধি স্থিরীকৃত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রহস্য ভেদ

দুই স্থানে দুই দৃশ্য। আমরা আগে কোনটি বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, একটি-একটি করিয়াই বলা যাউক।

ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী। কোলের মানুষ দেখা যায় না। এমন সময়ে রাজপুর-মধ্যস্থ উদ্যানের প্রান্তভাগে রাজবাটীর ধাত্রী এবং রাজকুলগুরু দণ্ডায়মান।

ধাত্রী কহিল, "গুরুদেব! একবার যদি সেখানে পৌঁছিতে পারি, তাহা হইলেই জানিলাম, এ যাত্রা কুমারের জীবন রক্ষা হইল।"

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন, "সেখানে পৌঁছিতে পারিবে এমন আশা রাখ কি?"

ধাত্রী। কেন গুরুদেব?

গুরু। পথে কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে না কি?

ধাত্রীও বুদ্ধিমতী। ইশারার কথার ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে উপায়?"

গুরু। পলায়ন।

ধাত্রী। কোথায়?

গুরু। সে উপায় আমি করিয়াছি। তুমি কুমারকে লইয়া আইস।

ধাত্রী। তবে মাতুলালয়ে যাইবার কথা তুলিলেন কেন"?

গুরু। মন্ত্রীর চোখে ধুলা দিবার জন্য। রাজ্যলোভ বড় লোভ। এই লোভে পড়িয়া কোনদিন মন্ত্রী রাজপুরেই কুমারকে হত্যা করিত, সে কথা কেহ জানিতে পারিত কি? কুমারের মাতুল করদ রাজা; মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে তাঁহার রাজ্যকে রাজ্য-সুদ্ধ উড়াইয়া দিতে পারেন। কি সাহসে তথায় প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব। কুমারের মাতুলালয়ে যাইবার কথা উঠিয়াছে, মন্ত্রীও রাজপুরে হত্যা করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন। লোকজন সমস্তই তাঁহার আয়ত্তাধীন। পথে পথে রাজকুমারকে ইহলোক হইতে সরাইবার আর বাধা কি? রাজভাণ্ডার মন্ত্রীর হস্তে; কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া উৎকোচপ্রদানে সমস্ত ঘটনা মিথ্যা করিয়া সাজাইবার বাধা কি? শেষে হয় ত কুমারের মাতুলের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে সুদ্ধ সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে। তখন তাহার উচ্চ আশায় বাধা দেয়, এমন সাধ্য কার?

ধাত্রী। উপায়?

গুরু। উপায় আমি করিয়াছি। তুমি রাজপুত্রকে লইয়া পলায়ন কর।

ধাত্রী। কোথায় যাইব?

গুরু। আমার পরম বন্ধু কাশ্মীরাধিপতির কুলগুরু, উদ্যানের বহির্ভাগে তাঁহার চারিজন শিষ্যসহ উপস্থিত আছেন। তাঁহা-দিগের সহিত আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি। তুমি উদ্যান হইতে বাহির হইলেই তাঁহারা তোমার সহায় হইবেন। তাঁহারা তোমা-দিগকে লইয়া কাশ্মীর যাত্রা করিবেন। তাহার পর এখানকার যাহা-কিছু করিবার, তাহা আমি করিব।

ধাত্রী। কবে পুনরায় আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইব ?

গুরু। শীঘ্রই।

ধাত্রী রাজকুমারকে আনিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। কুলগুরুও উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোমহর্ষক ষড়যন্ত্র

পাঠক একটি দৃশ্য দেখিলেন। এখন আর একদিক দেখুন।

রাজবাটীর একটি নিভৃত কক্ষে রাজবেশধারী মন্ত্রী, এবং তৎ-সম্মুখে দুইজন ঘাতক দণ্ডায়মান। তাহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যমরাজ পর্য্যন্তও ত্রাসে কম্পান্বিত কলেবরে প্রস্থান করেন। অনেকক্ষণ নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মন্ত্রী মস্তক উত্তোলন করিলেন। ঘাতক দুইজন নতভাবে আরও নিকটস্থ হইল। মন্ত্রী তাহাদিগকে কক্ষের বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে কহিলেন। তাহারা চলিয়া গেল।

আজ পাপীর চিন্তাকুলচিত্তে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। সেই জ্বালা সহিতে না পারিয়া মন্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল ; গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। একবার একখানি পালঙ্কে উপবেশন করিল ; আবার উঠিল—আবার বসিল। তথাপি কোনক্রমেই মন স্থির হইল না। শেষে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে কহিল, "কেমন করিয়া আমি এ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিব ? মহারাজ আমাকে

প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তাঁহার শিশুকে বধ করিয়া কেমন করিয়া জীবনধারণ করিব ? এখনও তাঁহার জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—এখনও তাঁহার উপদেশমালা জ্বলন্ত অক্ষরে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি কি করি ? রাজ্য-লিপ্সা বড়ই প্রবল। কুমার জীবিত থাকিতে আমার পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। আমার মিষ্টকথায় অপরাপর মন্ত্রী হইতে আপামর সাধারণ প্রজাবৃন্দ আমার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার সুবিচারে তাহারা মোহিত হইয়াছে। কিন্তু কুমারকে হত্যা করিলে রাজ্যমধ্যে নানাস্থল হইতে যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবে না, তাহা কে বলিল ? সাহসী যোদ্ধৃগণই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। তখন একটি পথ নিষ্কণ্টক করিতে গিয়া আমিও শত সহস্র বিপজ্জালে জড়িত হইয়া পড়িব। এতদিন আমি এই সকল ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। কিন্তু রাজ-কুলগুরু এখন সে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কুমার মাতুলালয়ে যাত্রা করিবে ; পথে তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে হইবে। অবশেষে তাহার মাতুলের উপর দোষারোপ করিয়া এই সুযোগে তাহার রাজ্যও কাড়িয়া লইব।

এইরূপে মন্ত্রী অনেকক্ষণ অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে কুক্রিয়াভিলাষী বিশ্বাসঘাতকের পরম ঔষধ মদিরা ছিল। তাহা পানপাত্রে ঢালিয়া ধীরে ধীরে উদরস্থ করিল। তখন চিন্তাস্রোত কথঞ্চিৎ উপশমিত হইয়া আসিল। এতক্ষণে মন্ত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। হলাহল মস্তকে উঠিয়াছে! আর মায়া নাই, মমতা নাই, ভয় নাই, মান নাই, অপমান বোধ নাই। মন্ত্রী ডাকিল,"হুসেন আলি!"

"খোদাবন্দ—জাঁহাপনা" বলিয়া এক ভীষণ মূর্ত্তি গঙ্গোপাধ্যায় হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিল। তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি, সেই গোল গোল রক্তবর্ণ চক্ষু, আর সমস্ত শরীরের দড়ার মত শিরাবলী দেখিলেই যথার্থই ভয়ের সঞ্চার হয়। মন্ত্রী পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হুসেন আলি! তুমি এ জীবনের মধ্যে কয়টা হত্যা করিয়াছ?"

হুসেন নির্ভয়চিত্তে উত্তর দিল, "তার কি সংখ্যা আছে? অর্থের জন্য কি না করিয়াছি?"

মন্ত্রী। তুমি কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছ, তাহা জান? আমি তোমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে পারি, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি?

হুসেন। কিন্তু মহারাজ! আমি যখন 'খুনী' বলিয়া এই রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন ভূতপূর্ব্ব মহারাজ আমায় বন্দী করেন। দুই-চারিদিন পরে আমার বিচার হইল। তিনি ঠিক আপনার মতই আমায় এই কয়টি কথা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার পর কহিলেন, "হুসেন! এ পৃথিবীতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তাই আমি তোমার প্রাণদণ্ড বিধান করিলাম না। তুমি অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিয়াছ; কিন্তু ভগবান্ তোমায় অসংখ্য জীবন প্রদান করেন নাই। সুতরাং অসংখ্য জীবহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমার একটি জীবনবধে পূর্ণ হইবে না বলিয়া আমি তোমায় বধ করিতে বিরত হইলাম। তুমি আজ হইতে জল্লাদরূপে রাজ-সরকারে চাকরী গ্রহণ কর।"

মন্ত্রীর মস্তক বিঘুর্ণিত, চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত, হৃদয়মধ্যে ভীষণ চিন্তার উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কণ্টকিত। মুখ দিয়া কথা বাহির হইয়াও হইতেছে না। মন্ত্রী বলিল, "আজ তোমার আমার কি আবশ্যক জান ?"

হুসেন। কেমন করিয়া জানিব, মহারাজ! আপনি যাহা হুকুম করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।

মন্ত্রী। আমি যা বল্‌ব, তাই কর্‌তে পার্‌বে ?

হুসেন। মহারাজ! আমাদের অসাধ্য কি আছে ? কিন্তু আপনার এ কথায় আমার মনে যেন আতঙ্কের উদয় হচ্ছে।

মন্ত্রী। তোমারও ভয় হচ্ছে ?

হুসেন। মহারাজ। ভয় কাকে বলে, তা আমি জানি না। কিন্তু তবুও আপনার মনে কি আছে, কে জানে ? আপনার এক-একটি কথায় আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌ছে। মহারাজ! ভূতপূর্ব্ব মহারাজের চেহারাখানা যেন আমার সম্মুখে—এই অন্ধকার রাত্রে যেন ধক্ ধক্ করে জ্বল্‌ছে——"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মন্ত্রী কহিল, "তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—কালই তোমার চাকরী জবাব দিব।"

চাকরীর জন্য হুসেন বড় গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু আজ যে মন্ত্রীর কঠোর হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইল, ইহাই পরম লাভ ভাবিয়া সে চলিয়া গেল। কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই আব্‌দুলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহাকে কহিল, "দেখ আব্‌দুল। আজ আমার প্রাণটা কেমন ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। যেন দুই-একদিনের মধ্যে একটা কি ভয়ানক ঘটনা ঘট্‌বে। তুই এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্—হয় ত তোকে রাজা এখনি ডাক্‌বে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বধসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

এমন সময়ে মন্ত্রী ডাকিল, "আব্‌দুল।"

"মহারাজ," বলিয়া উত্তর দিয়া আব্‌দুল দুই-এক পদ অগ্রসর হইল।

হুসেন তাহাকে তাড়াতাড়ি এই কয়টি কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিল, "হঠাৎ কোন কাজে বাজি হস্‌নে।"

আব্‌দুল ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র মন্ত্রী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পার্‌বে আব্‌দুল। তুমি কি আমায় চিন্তাহীন কর্‌তে পার্‌বে?"

আব্‌দুল কি উত্তর দিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। নীরবে মন্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্ত্রী আবার মদ্যপান করিয়া কহিল, "আব্‌দুল। তুমি খুন কর্‌তে পার?"

আব্‌দুল বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে মহারাজ?"

আব্‌দুলের বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রীবর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে "আব্‌দুল, তুমি খুন কর্‌তে পার?" এই কথা শুনিয়া সে চমকিত হইল।

মন্ত্রী আশীবিষের বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছিল। আব্‌দুলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ

উ—৪

আব্দুল! রাজসিংহাসনের বিরোধী রাজপুরে একজন ভয়ানক শত্রু আছে; আমি তাহাকে গুপ্তহত্যা কর্‌তে চাই। তুমি তাহাকে বধ কর্‌তে পার্‌বে?"

এবার আব্দুল ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই উত্তর দিল, "কি! মহারাজের পরম শত্রু! রাজ্যের শত্রু! রাজ্যসিংহাসনের বিরোধী! তাহাকে বধ করিতে আবার অন্য কথা! মহারাজ! আমি আপনার দাসানুদাস। অনুমতি করিলে প্রধান অমাত্যকে পর্য্যন্ত এই শাণিত ছুরিকায় শমনসদনে প্রেরণ করিতে পারি। যে সিংহাসনের শত্রু, সে রাজ্যের সমস্ত প্রজার শত্রু। মহারাজ! একবার অনুমতি করুন, অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইতে-না-হইতেই তাহার ছিন্নমস্তক আপনার পদতলে আনিয়া উপহার দিব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতঃ আব্দুল আপনার তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা বাহির করিল।

এতক্ষণে মন্ত্রী কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইল। আবার একবার মস্তিষ্ক তেজোহীনকারিণী সুরা পান করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পার্‌বে?"

আব্দুল স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞের ন্যায় উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই মহারাজ!"

মন্ত্রী। আমি রাজকুমারকে গুপ্তহত্যা কর্‌তে চাই—তুমি তাহাকে বধ কর্‌তে পার্‌বে?

যে আব্দুল 'সিংহাসনের' শত্রু এই কথা শুনিয়া তাহার বধসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল; কোযমধ্য হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া যে আব্দুল কতক্ষণে শত্রুর শোণিতে আপনার অসি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল; সেই আব্দুল মন্ত্রীর

কথায় সহসা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল। তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত, আপাদমস্তক কম্পিত, চক্ষু দীপ্তিহীন হইল—শাণিত ছুরিকা ভূমে পড়িয়া গেল!

বজ্রগম্ভীরস্বরে মন্ত্রী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! তুমি পারবে না? বিশ্বাসঘাতক! নেমকহারাম! রাজকার্য্যে এত অবহেলা!"

চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া আবদুল কহিল, "একি রাজকার্য্য! ভূতপূর্ব্ব মহারাজের শিশুপুত্রকে বধ করা কি রাজকার্য্য! তাঁহার বংশলোপ করা কি রাজকার্য্য! এ গুপ্ত-হত্যা করিয়া রাজকার্য্যের কি বিঘ্ন ঘুচাইবেন? মহারাজ! আমি বিশ্বাসঘাতক! আমি নেমকহারাম! আর আপনি তবে কি? মহারাজ! যদি আমি বিশ্বাসঘাতক হইতাম, তাহা হইলে হয় ত এতক্ষণ ভূতপূর্ব্ব মহারাজের একমাত্র বংশধরের নাম ইহ-সংসার হইতে বিলুপ্ত হইত!"

ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবরে মন্ত্রী তখন আপনার অসি নিষ্কাসিত করিয়া আবদুলের দিকে ধাবিত হইল। যদি আবদুল আপনার জীবন রক্ষার জন্য অসির আঘাত প্রতিরোধ না করিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ছিন্ন মস্তক মন্ত্রীর পদতলে লুণ্ঠিত হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু আবদুল আপনার অসির দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া বজ্রনিনাদে কহিল, "মহারাজ! বৃথা চেষ্টা! আমি বিশ্বাসঘাতক কি-না, তাহা এখনই দেখাইতে পারি—যদি ভূতপূর্ব্ব মহারাজের শিশুপুত্র একবার বলেন যে, "মন্ত্রীর ছিন্ন মস্তক আমি দেখিতে চাই!" শিশুপুত্রকে বধ করিয়া আপনি নিষ্কণ্টকে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিতে চাহেন; কিন্তু

মহারাজ! উপরে একজন আছেন, তাহা কি মনে আছে? অধর্ম্মের রাজ্য কতদিন থাকিবে, মহারাজ?"

মন্ত্রী উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, "তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

যথারীতি অভিবাদন করিয়া আব্‌দুল প্রস্থান করিল। মন্ত্রী ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবরে ভূমিতে পদাঘাত করতঃ আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "আজ হইতে রাজ্যে বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। আমার সিংহাসনের একজন শত্রু ছিল। আজ হইতে শত সহস্র শত্রু অভ্যুত্থান করিবে সন্দেহ নাই। কি করি, কোথায় যাই! যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন আর পশ্চাৎপদ হইব না।"

এই বলিয়া মন্ত্রী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুমার নিরুদ্দেশ

এদিকে কুলগুরু এবং ধাত্রীর বুদ্ধিমত্তায় রাজকুমার স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মন্ত্রী ভাবিয়া আকুল! তাহার এতদিনের আশা বুঝি নির্ম্মূল হইল! আব্‌দুল ব্যতীত তাহার মনোভাব আর কেহই জানিত না—আর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং গুপ্তচর লাগাইয়া আব্‌দুলকে হত্যা করাই তাহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। কাজেও ঘটিল তাই। তার পর প্রাতঃকালে মন্ত্রী যখন শুনিল যে, ধাত্রী রাজকুমারকে লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে;

তখন ভাবনায় আরও অস্থির হইয়া পড়িল, ভবিষ্যৎ সুখ-আশায় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল।

মন্ত্রী রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিল যে,"ধাত্রী রাজকুমারকে চুরি করিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। যে তাহার কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে কোটি স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব। রাজকুমারের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

আর এই সময় মন্ত্রী গুপ্তভাবে বহু অর্থব্যয় করিয়া গুপ্তচর এবং ঘাতক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে দেশে-বিদেশে পাঠাইয়া দিল। তাহাদিগকে বলিল যে, "তোমরা যেখানে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, সেইখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া চলিয়া আসিবে। কার্য্য সফল হইলে আমি যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিব।"

কুলগুরু জানিতেন, এ সকলই নিশ্চয় ঘটিবে। সুতরাং তিনি আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে সে বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

দশ বৎসর অতীত হইল। তথাপি রাজকুমারের সন্ধান হইল না। কুলগুরুর সুকৌশলে রাজকুমার কাশ্মীর-রাজ্যে পালিত হইতে লাগিলেন।

মন্ত্রী রাজকার্য্য সমস্তই করে। রাজার ন্যায় তাহার পূর্ণ অধিকার; সকলেই তাহাকে 'রাজা' সম্বোধন করিয়া থাকে; কিন্তু তথাপি তাহার অবোধ মন প্রবোধ মানিল না। মন্ত্রী এই দশ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া, চারিদিক পরিষ্কার রাখিয়া এক দিন বিরাট-সভা আহ্বানপূর্ব্বক আপনার অদ্বিতীয় বাগ্মীতাবলে প্রজাবর্গকে বুঝাইয়া দিল যে, রাজ্যে রাজা ভিন্ন কেহ সুশৃঙ্খলে,

সুচারুরূপে রাজ্য চালাইতে পারে না। কারণ তাঁহার সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে না, রাজার ন্যায় তিনি আপনার মতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতে অনেক সময়ে সুফল না ফলিয়া কুফল প্রসব করে। প্রজাগণ অমাত্যবর্গ সকলেই ইহা বুঝিলেন, সকলেই সম্মতি দিলেন, সকলেই একমত হইলেন। সুতরাং আর বাধা দিবার কেহ রহিল না—নির্ব্বিবাদে মন্ত্রী রাজপদে অভিষিক্ত হইল। কেবল প্রধান সেনাপতি সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্রীকে ইহা স্বীকার করাইয়া লইলেন যে, "নিরুদ্দেশ রাজকুমার যদি ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার রাজ্য তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।" মন্ত্রী তাহাতে কাল্পনিক আগ্রহের সহিত সম্মতি প্রদান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল। বহু কালের আশা এতদিনে সফল হইল।

মন্ত্রীর একটিমাত্র কন্যা। তদ্ব্যতীত সন্তানাদি আর কিছুই ছিল না। কুলগুরু একদিন মন্ত্রীকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার একটিমাত্র কন্যা; বিদ্যা-শিক্ষা করা তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। রাজকুমারের আর আসিবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ তাহা হইলে এ দশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তাহার কোন সংবাদও পাওয়া যাইত। হয় ত তিনি জীবিতই নাই। যাহা হউক, যদি তিনি আর ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে আপনার কন্যাই একপ্রকার সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাকে সুশিক্ষিতা করা একান্ত আবশ্যক।"

মন্ত্রী কুলগুরুর মনোগত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া কহিল, "আচ্ছা, আপনি আমার একমাত্র কন্যাকে আপনার

ভবনে লইয়া যাউন। এ বাটীতে থাকিলে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তাহার শিথিলতা জন্মিতে পারে।"

গুরুদেবও তাহাই চাহেন; তাঁহার উদ্দেশ্যও তাই! তথাপি তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, তবে তাই হবে।"

গুরুদেব মন্ত্রীকন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। সরমা নাম্নী তাঁহার একটি কন্যা ছিল। মন্ত্রীকন্যা দুই-একদিনের মধ্যেই তাহার সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুমার

কৃষ্ণ যেমন নন্দালয়ে বাড়িয়াছিলেন, রাজকুমারও তদ্রূপ কাশ্মীর-রাজ্যে বাড়িতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল, তখন গুরুদেব গুপ্তভাবে তাঁহাকে পুনরায় দেশে আনয়ন করিলেন। রাজকুমার জানিতেও পারিলেন না যে, কি পথে কোথা হইতে তাঁহাকে কোথায় আনা হইল। কেবমাত্র জানিলেন এবং জানিলেন, তিনি পালকপিতার গৃহ হইতে গুরুগৃহে আনীত হইলেন, কাশ্মীর রাজ্যে গুরুদেবের একজন বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে রাজকুমার পালকপিতা বলিয়া জানিতেন। তাঁহাকে এইমাত্র বলিয়া দিয়াছিলেন, "এতদিন পরে আমি তোমায় গুরুগৃহে প্রেরণ করিতেছি। তথায় তিনি তোমার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উত্তম আয়োজন করিয়া দিবেন।"

ঘটিলও তাহাই। রাজকুমার গুরুভবনে আগমন করিলেন; কুলগুরু তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার আকার-প্রকার রাজ-কুমারের ন্যায় দেখিতেছি, আমি তোমায় 'কুমার' বলিয়া ডাকিব।"

রাজকুমার ভিতরের কথা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, কিন্তু গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এই জ্ঞানে অবনতমস্তকে তাহাই স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "যে আজ্ঞা গুরুদেব!"

গুরুদেব মনে ভাবিলেন, "ভগবান্ আমায় বল দাও, আমি যেন মানসিক ত্রুটিতে এতদিনের গোপনীয় কথা আজ হঠাৎ প্রকাশ করিয়া না ফেলি। রাজকুমার জানে না, সে কোন্ উচ্চ-বংশসম্ভূত। তাই "কুমার" বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত হইল; কিন্তু হে করুণাসিন্ধু দয়াময়। তোমার বলে, তোমার কৃপায় আবার আমি ইহাকে পিতৃসিংহাসনে বসাইতে চাই। আমায় বল দাও প্রভু! বুদ্ধি দাও, যাহাতে আমি আমার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারি, তজ্জন্য আমায় আশীর্ব্বাদ কর।"

কুলগুরু সেনাপতিকে একদিন কহিলেন, "আমার একজন শিষ্য আমি আপনার নিকট প্রেরণ করিব। আপনি তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবেন। অতি শীঘ্র আমি তাহাকে উচ্চপদারূঢ় দেখিতে ইচ্ছা করি।"

সেনাপতি গুরুদেবকে বড় ভক্তি করিতেন। তিনি উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞা।"

তৎপর দিনই রাজকুমার গুরুদেবের হস্তলিখিত পত্র লইয়া দুর্গের ভিতর সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, "এ কে? ঠিক

ভূতপূর্ব্ব মহারাজের ন্যায়। হায়! কুমার এতদিন জীবিত থাকিলে এত বড় হইতেন, সন্দেহ নাই।"

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

রাজকুমার কহিলেন, "কুমার।"

সেনাপতি শিহরিয়া উঠিলেন। মনে নানাবিধ তর্ক উপস্থিত হইল। আবার অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতার নাম কি?" রাজকুমার কহিলেন, "জানি না, অতি শৈশবেই আমার পিতামাতার মৃত্যু হয়। আমি পরগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি। আমার পালকপিতার নাম শ্রীমাধবাচার্য্য স্বামী। তিনি আমায় গুরুগৃহে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।"

সেনাপতি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; অথচ সন্দেহও ঘুচিল না। তিনি সহকারী সেনাপতির হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আবার ভাবনাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রণয়ের সূত্রপাত

মন্ত্রীকন্যা বালিকা নহে। তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ। বিবাহের জন্য নানা দেশ হইতে নানা সম্বন্ধ আসিতেছে; কিন্তু গুরুদেবের চতুরতায় সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অথচ মন্ত্রী এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছে না।

ধীরে ধীরে মন্ত্রিকন্যার প্রাণে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে। অজ্ঞাতে 'কুমারকে' সে ভালবাসিয়াছে। অজ্ঞাতে তাহার মন প্রাণ চুরি গিয়াছে।

রাজকুমার দিবসে দুর্গমধ্যে থাকিয়া অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, আর সূর্য্যাস্তের মধ্যে তথা হইতে বাহির হইয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসেন। সরমা ও মন্ত্রিকন্যা প্রতিদিনই বাগানে ফুল তুলে, মালা গাঁথে, সরোবরে মালা ভাসাইয়া দেয়, তরুশাখায় মালা বাঁধিয়া রাখে, কিম্বা আপনার কবরীতে পরে, আর বসিয়া বসিয়া গল্প করে। ঠিক সেই সময়ে প্রতিদিনই রাজকুমার গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হন। সকলের সহিত সরলভাবে কথা কহেন। নূতন রণকৌশল কি কি শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিদিন গল্প করেন। মন্ত্রীকন্যা ও সরমা অবাক্ হইয়া তাহাই শুনে, আর কত কথা জিজ্ঞাসা করে।

মন্ত্রিকন্যা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কুমার! তোমার পিতা মাতার বিষয় তুমি কিছুই অবগত নও, সে বিষয়ে জানিতে চেষ্টা কর না কেন?"

কুমার কহিলেন, "তাতে তোমার কি হবে?"

লজ্জাবনতমুখে মন্ত্রিকন্যা কহিল, "অজ্ঞাতকুলশীলকে সকলে ঘৃণা করে।"

কুমার। তোমরাও কি ঘৃণা কর?

সরমা। না, আমরা ঘৃণা করব কেন, আমরা তোমার সঙ্গে কথা কয়ে বরং কত আহ্লাদিত হই। যতক্ষণ তুমি না এস, বিমলা (মন্ত্রীকন্যার নাম বিমলা) ততক্ষণ যেন কেমন এক রকম হয়ে থাকে, তুমি এলেই কত হাসে, কত ফুলের মালা গাঁথে, কত গল্প করে।

কুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বিমলা! তুমি এমন কর?"

বিমলা কি উত্তর দিবে, খুঁজিয়া পাইল না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কষ্টে-সৃষ্টে উত্তর দিল, "তুমি বেশ গল্প কর, আমি তোমার গল্প শুন্‌তে বড় ভালবাসি। গুরুদেব বলেছেন, 'তোমরা কুমারকে সামান্য বংশীয় বলে মনে করো না। কোন উচ্চবংশে তাঁহার জন্ম।' আজি হউক, কালি হউক, দুই বৎসর পরে হউক, যত শীঘ্র সম্ভব, উঁহার পালকপিতা আমায় কুমারের বংশ বিবরণী লিখিয়া পাঠাবেন। তিনি লিখেছেন, অজ্ঞাতকুলশীল বলে কুমারকে কেহ ঘৃণা না করে। কোন বিশেষ কারণবশতঃ তিনি এখন উঁহার জন্মবৃত্তান্ত গোপন রাখ্‌ছেন।"

কুমার। গুরুদেব আমায়ও তাই বলেছেন।

সেইদিন হইতে কুমার বিমলার শূন্যদৃষ্টিতে অর্থ দেখিতে পাইলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার মনের গতি সেইদিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

দিন যায়, দিন আসে। কুমার ও বিমলার ভালবাসা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। কেহই কিছু জানিতে পারে না। অথচ প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ। উভয়কে দেখিলে উভয়ে সুখী হয়, তাহাদের পরস্পরের প্রাণ জুড়ায়।

প্রথম প্রথম বিমলা সরলা বালিকার ন্যায় সরল প্রাণে সহাস্য-বদনে কুমারের সহিত কথা কহিত; কিন্তু এখন আর তাহা করে না—লজ্জা বোধ করে। দেখিয়া-শুনিয়া একদিন সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "এত কেন লো?"

বিমলা। কি লো?

সরমা। বলি, তোর এ কেমনতর লো?

বিমলা। বেশ লো!

সরমা। বা'লো! তবে সই! ছাড়া পাখী বাঁধা পড়েছে?

বিমলা। শিকলি তবু পরেনি।

সরমা। পর্‌লে কি আর দেখা হবে না?

বিমলা। কোন্ পাখী ভাই! শিকলি কেটে আস্‌তে পারে?

সরমা। বলি, প্রাণটি ভাসালি কেন?

বিমলা। গাছ থেকে শুক্‌নো পাতা নদীতে পড়্‌লো, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌গে—'ও পাতা! তুই স্রোতের টানে ভেসে যাস্ কেন?'

সরমা। তবে আর কি, মা বাপকে খবর দে যে, তুই বিক্রী হয়ে গিয়েছিস্।

বিমলা। কৈ হয়েছি? এখনও ত দর কসা-মাজা হচ্ছে।

সরমা। ভ্যালা মেয়ে যা হোক বাপু! তোর সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠ্‌বে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আশায়

কুমার নিজ প্রতিভাবলে ক্রমশঃই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সেনাপতি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন, সকল যুদ্ধে কুমারকে পাঠাইতে তাঁহার মন সরিত না; কিন্তু কুমার ইচ্ছাপূর্ব্বক রণে গমন করিতেন।

গত যুদ্ধে সহকারী-সেনাপতি হত হইয়াছেন, আজ সেই পদ কাহাকে দিবেন, সেনাপতি মহাশয় তাহাই ভাবিতেছেন। এমন সময়ে কুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

কুমার। বিপক্ষ পক্ষের সেনা-সংখ্যা বিংশতি সহস্র মাত্র, এখনও তাহারা বহু দূরে আছে। রজনীতে আসিয়া আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই।

সেনাপতি। কুমার। আজ আমি তোমার কথায় সন্তোষ আরও অধিক পরিচয় প্রার্থনা করি। তুমি যদি দশ সহস্র সেনা লইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় বিংশতি সহস্রকে পরাজিত করিতে পার, তা হলে আমি তোমায় সহকারী সেনাপতিপদে বরণ করব। দশ সহস্র সেনা লইয়া বিংশতি সহস্র সেনা পরাজয় করতে পারবে ?

কুমার। সে কথা এখন ঠিক করে বল্‌তে পারি না, ভবিষ্যৎকাল-গর্ভে যাহা নিহিত, কেমন করে পূর্বে আমি তাহা বল্‌তে পার্‌ব। তবে এই পর্যন্ত বল্‌তে পারি, দশ সহস্র সেনা লইয়া রীতিমত ব্যূহ রচনা করে কৌশলে যুদ্ধ করলে বিংশতি সহস্র কেন, অর্দ্ধলক্ষ সেনা অবহেলায় পরাজিত করতে পারা যায়। এ দাসের উপর যদি সে ভার অর্পিত হয়, তা হলে দাসও তাহাতে পরাঙ্মুখ হবে না—বা কৌশলে যুদ্ধে জয়লাভ করতে নিষ্ফল হবে না।

তখন সেনাপতি কুমারকে ব্যূহ রচনার বিষয় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার যাহা উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে সেনাপতি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি নিজে যে সকল বিষয় জানিতেন না, আজ কুমারের মুখে তাহা শুনিয়া আত্মশ্লাঘায় হৃষ্ট-চিত্তে কহিলেন, "কুমার! তবে এখন স্বগৃহে যাও, যথাসময়ে দুর্গে উপস্থিত হয়ে সহকারী সেনাপতিত্বভার গ্রহণ করবে—আমি অন্যান্য সমস্ত আয়োজন করে রাখ্‌ব।"

অবনতশিরে যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া কুমার গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুদ্ধের সংবাদ কি কুমার ?"

কুমার অবনতমস্তকে উত্তর করিলেন, "আজ রজনীতে যুদ্ধ হবে, এইরূপ গুপ্ত সংবাদ জান্‌তে পেরেছি।"

গুরু। তুমি যুদ্ধে যাবে ?

কুমার। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। গত যুদ্ধে সহকারী সেনাপতি হত হয়েছেন—আজ কে সহকারীর কার্য্য কর্‌বে ?

কুমার লজ্জাবনত মুখে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

গুরুদেব তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন, "সেনাপতি কি তোমারই স্কন্ধে সে ভার অর্পণ করেছেন ?"

কুমার। আজ্ঞা হাঁ।

গুরুদেব। ভাল, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার কোন বিপদ্ ঘট্‌বে না। নির্ব্বিবাদে দেশের মুখোজ্জল করে, বিজয়-পতাকা লয়ে তুমি ফিরে আস্‌বে। যাও, এখন অন্তঃপুরে অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ করে এস।

কুমার চলিয়া গেলেন। গুরুদেব তাঁহার মঙ্গলকামনায় ইষ্ট দেবারাধনায় উপবেশন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদায়

সরমা ও বিমলা উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল। রাজ্যের খুঁটিনাটির তাহারা বড় কোন খোঁজ-খবর রাখে না। দুইজনে আপনার আপনার কথা লইয়াই কত কথা কহিতেছিল। এমন সময়ে কুমার তথায় উপস্থিত হইলেন।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধের সংবাদ কি?"

কুমার। স্ত্রীলোকে যুদ্ধ-সংবাদ জেনে কি কর্‌বে?

সরমা। আমায় বল্‌বে না? আচ্ছা বিমলা! তুই জিজ্ঞাসা কর না ভাই?

বিমলা। আমি পার্‌ব না। তোর দরকার হয়, তুই জিজ্ঞাসা কর্‌গে।

বিমলা এই কয়টি কথা বলিয়া লজ্জাবনতমুখী হইল।

সরমা সমস্তই বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া বলিল, "না ধন, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।" এই বলিয়া সে ছুটিল।

বিমলা, "দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি," এই বলিয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও কতকটা অগ্রসর হইল।

সরমা দূর হইতে কহিল, "আমি এখনি আসছি।"

বিমলা কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—অথচ যেন বিষম লজ্জায় পড়িল।

কুমার ডাকিলেন, "বিমল!"

বিমলার স্বর বাহির হইল না। ধীরে ধীরে অবনতশিরে কুমারের নিকটবর্ত্তিনী হইল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমল! আজ আবার আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও—আমি যুদ্ধে যাব।"

চমকিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যাঁ! কেন?"

কুমার মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বিমলা! তুমি স্ত্রীলোক, তায় বালিকা। যুদ্ধের প্রয়োজন তোমায় আমি কি বুঝাব বল, তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ, যুদ্ধ নহিলে তোমার পিতার সিংহাসন, রাজ্য, ধন, জন, মান কিছুই থাক্‌বে না—শত্রুপক্ষে সমস্তই কেড়ে নেবে——"

সমস্ত কথা শেষ হইতে-না-হইতেই বিমলা কুমারের হস্ত-ধারণ করিয়া বলিল, "তুমি এবার যুদ্ধে যেও না।"

কুমার। কেন বিমল! তোমার তায় ভয় কি? সেনাপতি মহাশয় আমার উপর অন্যকার জন্য সহকারী-সেনাপতির ভার অর্পণ করিয়াছেন। যদি জয়ী হতে পারি, তা হলে আমাকেই তিনি ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন। সহকারী সেনাপতিত্ব আমিই প্রাপ্ত হব।

বিমলা। শুনেছি, যুদ্ধস্থল নাকি বড় ভয়ানক! সেখানে কেমন করে তুমি যাবে? আমি তোমায় আজ কিছুতেই যেতে দিব না।

ঈষৎ মৃদুহাসি হাসিয়া কুমার কহিলেন, "কেন? তুমি ত সেদিন বারণ কর নাই।"

বিমলা। যুদ্ধে কি বিপদ্ হ'তে পারে, তখন আমি তা জান্‌তাম না।

কুমার। তুমি ত তোমার পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয় বীরগণের অপূর্ব্বকাহিনী পাঠ করেছ। অনেক বীরাঙ্গনার ইতিহাসও তোমার কণ্ঠস্থ হয়েছে। সেই পবিত্র আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করে তোমার এ হীনমতি হল কেন?

বিমলা এ তিরস্কারে নতমুখী হইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

কুমার কহিলেন, "বিমলা! তবে বিদায়। ইষ্টদেবের নিকট স্বদেশের মঙ্গল কামনা কর—আজ যেন আমি এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারি।"

কুমার চলিয়া গেলেন। বিমলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সরমা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে এক ধাক্কা দিয়া হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বিমলাকে বিশেষ লজ্জিত করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

পত্রাবলী

কুমার সেদিনকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহাদিগের রাজ্য জয় করিয়া লইলেন। সেখানে তাহাদিগের বিজয়পতাকা উড়িল। কুমার সেখান হইতে মাতা, মহারাজ, গুরুদেব, সেনাপতি এবং বিমলা এই চারিজনের নামে চারিখানি পত্র লিখিলেন। যথা;—

প্রথম পত্র মন্ত্রী মহাশয়ের নামে লেখা হইল।

মহারাজ!

এ দাস আপনার নিকট পরিচিত নহে, কিন্তু মান্যবর সেনাপতি, পূজ্যপাদ গুরুদেবের নিকট আমার পরিচয় পাইতে পারেন। সেনাপতি মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় একদিনের জন্য সহকারী সেনাপতি পদে বরণ না করিলে এ যশের ভাগী হইতে আমি পারিতাম না। তাঁহার অনুগ্রহে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে ও ঈশ্বর প্রসাদে এ দাস শত্রুর পরাক্রম ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগের রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধে মান্যবর সেনাপতি মহাশয় কিঞ্চিৎ আহত হইয়াছেন। পঞ্চ সহস্র সেনাসহ তিনি আপনার রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমি অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে জয় করিয়া আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছি। এখন ইহা আপনার রাজ্য, আপনি কোন সুবন্দোবস্ত করেন, ইহাই প্রার্থনা। অনুমতি হইলেই দাস প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে।

অনুগ্রহপ্রয়াসী
শ্রীকুমার।

দ্বিতীয় পত্র সেনাপতির নামে।

মান্যবর সেনাপতি মহাশয়!

আপনার অনুগ্রহে, আপনার উৎসাহে, এ দাস শত্রুরাজ্যে বিজয়পতাকা স্থাপন করিতে পারিয়াছে। আপনি কেমন আছেন, জানিতে ব্যগ্র হইয়াছি। কবে আপনার শ্রীচরণ দর্শন

পাইব, তাহা পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিলে এ দাস কৃতকৃতার্থ হইবে।
কিমধিকমিতি——

স্নেহাভিলাষী
শ্রীকুমার।

তৃতীয় পত্র গুরুদেবের নামে।

পূজ্যপাদ গুরুদেব!

আপনার আশীর্ব্বাদে এ দাস মহারাজের শত্রুদল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগের রাজ্যে বিজয়-ভেরী নিনাদিত করিল। যাহাতে আমি অক্ষতশরীরে এইরূপ দিনে দিনে মহারাজের রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিতে পারি, তজ্জন্য আমায় আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেই আমি প্রত্যাগমন করিয়া আপনার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া জন্ম সফল করিব।:

পদধূলি প্রয়াসী
আপনার আদরের কুমার।

চতুর্থ পত্র বিমলার নামে।

বিমলা!

যে যুদ্ধে আসিতে বারণ করিয়াছিলে, সে যুদ্ধে তোমার পিতার জয় হইয়াছে। আমি একপ্রকার অক্ষতশরীরে রাজ-কার্য্য সাধন করিয়াছি। কবে গিয়া আবার তোমায় দেখিব, ভাবিতেছি।

তোমার একান্ত প্রিয়
তোমাদের অজ্ঞাতকুলশীল
শ্রীকুমার।

মন্ত্রী-মহারাজ যখন শুনিলেন, কুমার একটি নবরাজ্য জয় করিয়াছেন, তখন তিনি বড় আহ্লাদিত হইলেন। সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার কে?"

সেনাপতি সমস্ত কথা বলিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "আপনি তথায় গিয়া রাজ্য স্থাপন করুন। আর কুমারকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

সেনাপতি কহিলেন, "যে আজ্ঞা প্রভু।"

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন, "মহারাজ! কুমারকে আমি আমার সহকারীর পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। কেবল আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা।"

মন্ত্রী-মহারাজ তাহাতে অতিশয় আহ্লাদিতচিত্তে উত্তর করিলেন, "এই আমার স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া আপনি গমন করুন। যে বীর দশ সহস্র সৈন্য লইয়া অবহেলায় বিংশতি সহস্র সৈন্য পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহাকে রাজ্যের একটা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে আর কাহার বাধা থাকিতে পারে?"

সেনাপতি অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। মন্ত্রী-মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, "কুমার কে?"

রাজকুলগুরুকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "আপাততঃ ইহাকে অজ্ঞাত-কুলশীল-বীর যুবা বলিয়া জানিবেন। অন্য কথা আমি কিছু বলিব না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্রের অবসান

মহাসমারোহের সহিত কুমারকে রাজ্যে আনয়ন করা হইল। প্রথমেই তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মহারাজ প্রথম দর্শনেই চমকিত হইলেন; যেন ভূতপূর্ব মহারাজের মূর্তি ছায়ারূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান!

অতি কষ্টে মানসিক বল সংগ্রহ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি? তুমি কোন্ বংশ উদ্ভব করিয়াছ?"

কুমার কহিলেন, "মহারাজ। গুরুদেব আমার নাম 'কুমার' রাখিয়াছেন। আমি অজ্ঞাতকুলশীল, এতাবৎকাল আমি তাঁহারই অনুগ্রহে প্রতিপালিত।"

ব্যগ্রভাবে মন্ত্রী-মহারাজ কহিলেন, "রাজকুলগুরু এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকট তাহা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু যথার্থই কি তুমি অজ্ঞাতকুলশীল?"

সমস্ত কথা শেষ হইতে-না-হইতেই বিমলা দ্রুতবেগে আসিয়া পিতৃপদে লুটিয়া পড়িল। পশ্চাতে রাজা, রাজকুলগুরু, প্রধান মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক। বিমলা কহিল, "পিতা! উঁহার পরিচয় আমি জানি, আমায় জিজ্ঞাসা করুন।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে মন্ত্রী-মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি ব্যাপার!"

কুলগুরু বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি শৈশবাবধি রাজপুত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী-মহারাজের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল,

কুমার তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর রাজকুলগুরু কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণান্তর আবার বলিতে লাগিলেন, "হে ধীমান্ প্রজাবর্গ! প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্যগণ! আজ তোমরা আবার তোমাদের রাজা ফিরাইয়া পাইলে। বর্ত্তমান মহারাজা প্রতিশ্রুত আছেন, ভূতপূর্ব্ব মহারাজের শিশুপুত্র যদি কখন ফিরিয়া আসে, তবে তাহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন। এখন সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন; নহিলে যে পাপকার্য্য তিনি করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এ নশ্বর পৃথিবীতে অন্য কিছুতেই হইবে না। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়া তবে রাজকুমারকে জীবিত রাখিয়াছি। মহারাজ! এখন আপনি রাজকুমারকে তাঁহার পিতৃসিংহাসন প্রত্যর্পণ করুন। আপনি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আজি আমি এতদিন পরে সময় বুঝিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলাম। যদি একজনেরও আমার কথায় সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বলুন—আমি ইঁহার ধাত্রীকে পর্য্যন্ত আনাইয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণে আমি ইহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিব।"

আর অধিক কথা কহিতে হইল না। মন্ত্রী-মহারাজ রাজকুল-গুরুর পদে লুটাইয়া কহিলেন, "গুরুদেব! আমায় রক্ষা করুন।"

কুলগুরু কহিলেন, "আমার কি সাধ্য, আমি তোমায় রক্ষা করিব। প্রথমে রাজপুত্রের নিকটে তার পর আ-পামর সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর—যদি সকলে তোমায় রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

মন্ত্রী-মহারাজ তাহাই করিলেন। করযোড়ে কহিলেন, "রাজকুমার! আমায় রক্ষা কর।"

রাজকুমার একবার গুরুদেবের মুখপানে চাহিলেন—তার পর বিমলার সহিত চারিচক্ষু সম্মিলন হইল। তিনি নতমুখে উত্তর করিলেন, "করিলাম।"

তখন মন্ত্রী-মহারাজ আবার সেইরূপ করযোড়ে প্রজাবর্গের দিকে ফিরিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে কহিলেন, "আমায় ক্ষমা কর।"

দুই-চারিজন প্রধান অমাত্য সমস্বরে কহিলেন, "যে অপরাধ আপনি করিয়াছেন, তাহার ক্ষমা নাই—তবে রাজকুমার যখন আপনাকে ক্ষমা করিলেন, তখন আমাদের আর কোন কথা নাই।"

"জয় রাজকুমারের জয়—জয় কুমারের জয়!"

জয়ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিয়া উঠিল। তাহার সহিত বৃদ্ধ কুলগুরু উল্লাসে উন্মাদের ন্যায় লম্ফন করিতে করিতে কহিলেন, "জয় জগদীশ্বরের জয়! জয় রাজকুমারের জয়!"

সকলে নিস্তব্ধ হইলে কুলগুরু নিজহস্তে কুমারকে সিংহাসনে বসাইলেন। তার পর মন্ত্রী-মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দাও, তুমি নিজহস্তে রাজকুমারের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দাও—আর তোমার কন্যা বিমলাকে উঁহার হস্তে সমর্পণ কর। ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভরিয়া বল, জয় রাজকুমারের জয়।"

কলের পুত্তলিকার ন্যায় মন্ত্রী-মহারাজ তাহাই করিলেন। সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এতদিনে বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রের অবসান হইল।

সমাপ্ত।

আদর্শসাক্ষী

কলিকাতায় এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহারা আজীবন মামলা-মোকদ্দমা লইয়াই কাল অতিবাহিত করেন, মোকদ্দমাই তাঁহাদিগের পেশা ; লোকের টাকা ফাঁকী দেওয়াই তাঁহাদিগের কার্য্য ; অধর্ম্মে অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁহাদিগের জীবনের ব্রত।

নির্ব্বিবাদ মসীজীবী কেরাণিগণ এ সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না ; তাঁহারা এ সকল নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় অবগত নহেন।

অনেকে অনেক প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করেন, কিন্তু যে বিষয় বর্ণন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদপেক্ষা ঘৃণিত—তদপেক্ষা জঘন্য কার্য্য বোধ হয়, জগতে আর নাই। ঘটনাটি সত্য ! আর সত্য বলিয়াই আমরা কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের হস্তে ইহা সাহস করিয়া প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ব্যাপার কি ভয়ানক। এই সকল জুয়াচোরদিগের বিষয় বর্ণন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়। আজ এক নূতন ধরণের জুয়াচুরির উদাহরণ দিব। ইহাকে জুয়াচুরি বলে, চতুরতা বলে কি, কোন্ প্রকার ব্যবসা বলে, তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু ইহাদিগের কার্য্যকলাপ এত জঘন্য যে, ইহাদিগের দ্বারা প্রতিদিন কত নিরপরাধীর সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আদালতে উপস্থিত হইয়া কেহ দুই দণ্ড এদিক-ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেই টেরিটী বাজারের জুতাওয়ালাগণের ন্যায় মিথ্যাসাক্ষী ও মোক্তারগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিবে। কেহ আসিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিবে, "মশায়! কিছু কাজ আছে নাকি?' আমার পাল্লায় খুব ধড়ীবাজ সাক্ষী আছে। এক কথায় আপনার মোকদ্দমা হাসিল করিয়া দিবে।" অপর একজন হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া বলিবে, "আপনি ওদের কথা শোনেন কেন, আমি আপনাকে আট আনায় এম এ, বি এল, পাস করা উকীল জোগাড় করিয়া দিব—মোকদ্দমা চালাইবার ভাবনা কি?" এই প্রকার মোক্তারদিগের ও মিথ্যাসাক্ষীগণের জ্বালায় আপনাকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে। তাহার উপর যদি যথার্থই আপনার কোন মোকদ্দমা থাকে এবং আপনি সেইরূপ ভাব প্রকাশ করেন—তাহা হইলেই সোণায়-সোহাগা। আপনাকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া "দশচক্রে ভগবান্ ভূত" বানাইবে।

আজকাল এই মিথ্যাসাক্ষীর ব্যাপারটা এত ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পদে পদে অধর্ম্মেরই জয় হইতেছে। যে যথার্থ টাকা ধার দিয়াছে, সে হয় ত এক পয়সাও ফিরিয়া পাইতেছে না—আর যে চন্দ্র সূর্য্য ও তেত্রিশকোটী দেবতা ও গঙ্গাজল লইয়া শপথ করিয়া টাকা ধার লইয়াছে, সে হাসিতে হাসিতে মিথ্যাসাক্ষীর সাহায্যে জয়লাভ করিয়া খরচ-খরচাসমেত আদায় করিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। আদালতের জজ বিপক্ষপক্ষীয় উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ এই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। ধরা বাঁধা নিয়মের

উপর ত আর জারিজুরী চলিবে না ; কাজেই বুঝিয়া-সুঝিয়াও তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না। জানিয়া-শুনিয়াও তাঁহারা ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না। হায়! হায়! বসুন্ধরা ঘোর কলিগ্রস্ত হইয়া কেমন করিয়া এই পাপিগণের ভার বহন করিতেছেন।

মিথ্যাসাক্ষী দিবার জন্য কত লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, সামান্য অর্থের জন্য প্রতিদিন কত মিথ্যাকথা কয়, কত 'হয়কে' 'নয়' করে, তাহা কে জানেন ? কে তাহার তত্ত্ব রাখে ? ইহারা এত চতুর যে, বিচারপতি পর্য্যন্ত ইহাদের উপর কোন কথা কহিতে পারেন না। তোমায় একটি মোকদ্দমা করিতে হইবে, উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে তুমি হয় ত তাহাতে অগ্রসর হইতে পারিতেছ না ; কিন্তু সামান্য অর্থব্যয় করিয়া পেশাদার মিথ্যা-সাক্ষী জোগাড় কর, দেখিবে তোমার জয় অনিবার্য্য। তাহারা এমন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, যেন যথার্থই সে সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিল।

একদিন একজন লোক আদালতে অপর একজন লোকের নামে ৭৫৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছিল। আসামী তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু ফরিয়াদী তিনজন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করাইয়া কেমন করিয়া জয়লাভ করেন, তাহা বলিতেছি। এই স্থানে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, উক্ত তিনজন সাক্ষী ফরি-য়াদীর উকীল দ্বারা বিশেষরূপে শিক্ষিত হইবার সময় পায় নাই। এমন কি তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া দেওয়াও হয় নাই।

মোকদ্দমা উঠিল। আসামীর পক্ষের উকীল, তাঁহার মক্কেলের দেনা অস্বীকার করিলেন। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল।

ফরিয়াদীর পক্ষের প্রথম সাক্ষীর ডাক হইলে সে আসিয়া কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইল। রীতিমত শপথ গ্রহণ করিল।

আসামীর পক্ষীয় উকীল জেরা করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"আচ্ছা, তুমি ইঁহাকে টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

স্থির, ধীর, প্রশান্তবদনে পেশাদার সাক্ষী উত্তর প্রদান করিল, "হাঁ, দেখিয়াছি।"

উকীল। তুমি বিচারপতির সম্মুখে ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়াছ, তাহা মনে আছে?

সাক্ষী। আছে।

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, উক্ত সাক্ষীকে যখন শপথ করান হয়, তখন সে মৃদুগুঞ্জনে বলিয়াছিল, "আমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি,এই আদালতের সম্মুখে আজ মিথ্যা বই সত্য বলিব না।"

যিনি শপথ করাইতেছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, বল, "সত্য বই মিথ্যা বলিব না।"

সাক্ষী অর্দ্ধেক কথা পেটে—আর অর্দ্ধেক কথা মুখে, অর্দ্ধেক প্রকাশিত—অর্দ্ধেক অপ্রকাশিতভাবে বলিয়াছিল, "মিথ্যা বই সত্য বলিব না।"

তাহার এ কথা কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মিথ্যা-সাক্ষিগণ প্রায়ই এ কথা বলিয়া থাকে।

উকীল। যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য বলিবে?

সাক্ষী। হাঁ, বলিব।

উকীল। তুমি বলিতেছ, "টাকা দিতে দেখিয়াছি;" আচ্ছা, এই ৭৫৲ টাকা কখন দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, দিনের বেলায়।

উকীল। টাকা কোথায় ছিল?

সাক্ষী। একটা থলিতে।

উকীল। থলিটি কি রঙের?

সাক্ষী। আজ্ঞে, কাল রঙের।

উকীল। কোন স্থানে বসিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদী নিজ বাটীতে, বহির্বাটীর ঘরে, এই টাকা প্রদান করেন।

উকীল। আচ্ছা, যখন টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তখন তোমরা কিসের উপর বসিয়াছিলে?

সাক্ষী। শতরঞ্চীর উপর।

উকীল। আচ্ছা, তুমি যাইতে পার।

প্রথম সাক্ষী চলিয়া গেল। পরে দ্বিতীয় সাক্ষীর ডাক হইলে সে আসিয়া বিচারপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। যথাবিধি হলপ্ (শপথ) গ্রহণের পর আসামীর পক্ষের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

সাক্ষী। আজ্ঞে হাঁ, ফরিয়াদী আসামীকে অমুক দিবস ৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছিল, আমি দেখিয়াছি।

উকীল। টাকা কখন দেওয়া হইয়াছিল।

সাক্ষী। আজ্ঞে, রাত্রিতে।

প্রথম সাক্ষীর সহিত একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আদালত শুদ্ধ সকলেই হাসিয়া আকুল। সকলেরই বিশ্বাস হইল, ফরিয়াদী মিথ্যাসাক্ষী দ্বারা মোকদ্দমা চালাইতেছেন। প্রথম সাক্ষী স্পষ্ট বলিয়া গেলেন, "টাকা দিনের বেলায় দেওয়া হইয়াছিল," আর

দ্বিতীয় সাক্ষী একেবারে তাহার বিপরীত কথা বলিল। কাজেই সকলের অবিশ্বাস জন্মে। আরও এক কথা, পাকা উকীলে কখন কিরূপভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহা বলা যায় না। হয় ত এমন এক সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, মিথ্যা-সাক্ষিগণের সহিত কাহারই ঐক্য হইল না—কাজেই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। উপরোক্ত দুইজন মিথ্যাসাক্ষীও সেইরূপ জেবাব মধ্যে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রথম সাক্ষী এবং দ্বিতীয় সাক্ষীর এইরূপ কথার বিভিন্নতা শ্রবণে আসামীর পক্ষীয় উকীল মৃদুহাসি হাসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা কিসে ছিল?"

সাক্ষী। আজ্ঞে, একটি থলিতে।

উকীল। থলিটি কি রঙের?

সাক্ষী। আজ্ঞে, লাল রঙের।

উকীল। কোন্ স্থানে এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, দালানে।

উকীল। আচ্ছা, সেই সময় তোমরা কিসের উপর বসিয়াছিলে?

সাক্ষী। মাদুরের উপর।

আসামীর পক্ষের উকীল, বিচারপতির দিকে চাহিয়া মৃদুমধুর হাসি হাসিলেন। তৎপরে আসামীর জয়লাভ অনিবার্য্য ভাবিয়া দ্বিতীয় সাক্ষীকে বিদায় দিলেন। পরে তৃতীয় সাক্ষীর ডাক হইল। পাঠকগণ! স্মরণ রাখিবেন, প্রথম এবং দ্বিতীয় সাক্ষী যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, তাহা উভয়তঃ সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম সাক্ষী বলিয়াছিল, "দিনের বেলায় টাকা দেওয়া হইয়া-

ছিল।" কিন্তু দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল, "রাত্রিতে টাকা দেওয়া হয়।" প্রথম সাক্ষী "থলিটা কাল রঙের" বলিয়াছিল—আর দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল, "লাল।" প্রথম সাক্ষী বলিয়াছিল, "ফরিয়াদী নিজ বাটীতে বহির্ব্বাটীর ঘরে ৭৫৲ টাকা প্রদান করেন।" আর দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল, "টাকা দালানে বসিয়া দেওয়া হইয়াছিল।" প্রথম সাক্ষী বলিয়াছিল, "শতরঞ্চীর উপর বসিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছিল।" আর দ্বিতীয় সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রকাশ, টাকা দিবার সময় তাহারা মাদুরের উপর বসিয়াছিল।

এই সকল সামান্য সামান্য কথায় এত তফাৎ দেখিয়া বাস্তবিক বিচারপতির পর্য্যন্ত ধারণা হইল—হয় ত টাকা দেওয়া হয় নাই—সাক্ষীরা মিথ্যাকথা কহিতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষী, তারিখ, টাকা, থলি ইত্যাদি গোটা দুই-তিন বিষয় ঠিক ঠিক বলিয়াছিল। কিন্তু যে বিষয় কিছুই জানে না—জেরার মুখে সে প্রকার প্রশ্ন করিলে কাজেই ঠকিতে হয়। তাহাদেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

এই সময়ে তৃতীয় সাক্ষীর ডাক হইল। সে আসিয়া কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই সকলের অনুমান হইল, একটি পাকা বদমায়েস উপস্থিত হইয়াছে।

উকীলের মনে মনে ধারণা, তাঁহার পক্ষে জয় অনিবার্য্য। কাজেকাজেই মৃদুমধুর হাসি হাসিতে হাসিতে তিনি তৃতীয় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমিও কি এ টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

সাক্ষী। হাঁ, দেখিয়াছি।

উকীল। টাকা কিসে ছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, একটা থলিতে।

উকীল। থলিটি কি রঙের? "লাল" না "কাল"?

সাক্ষী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তার পর উত্তর দিল, "আজ্ঞে, থলিটার রঙ—লাল বলিলেও হয়, কাল বলিলেও বলা যায়।"

বিচারপতি এবং আসামীর পক্ষীয় উকীল চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি রকম? পরিষ্কার করিয়া বল।"

সাক্ষী। আজ্ঞে, থলির ত দু পিঠ থাকে?

উকীল। হাঁ থাকে, তাতে কি?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমিও ত তাই বল্‌ছি, থলিটার এক পিঠে লাল রঙের কাপড় ও আর একপিঠে কাল রঙের কাপড় ছিল। তাই বলিয়াছি, "কাল" বলিলেও বলা যায়, "লাল" বলিলেও বলা যায়। তা ধর্ম্মাবতার! যে যে ভাবে গ্রহণ করে——

উকীল। আচ্ছা, টাকা কোথায় দেওয়া হইয়াছিল? "দালানে" না "ঘরে?"

সাক্ষী। আজ্ঞে, সে স্থানটাকে দালান বলিলেও বলা যায়, ঘর বলিলেও বলা যায়।

উকীল। সে কি রকম?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদীর বাড়ীতে যে দালান আছে, তাহার প্রত্যেক থাটালে দরজা বসান আছে। দরজা খুলিয়া ঠাকুরপূজা করিলেই দালান বলা হয়। আর পূজা ফুরাইয়া গেলে দরজা দিয়া তাহার ভিতরে বসিলেই বহির্ব্বাটীর ঘর হইল।

উকীল। আচ্ছা, টাকা দিবার সময় তোমরা ফরিয়াদীর বাড়ীতে কিসের উপর বসিয়াছিলে, তাহা মনে আছে কি?

"মাদুরে" কি "শতরঞ্চীর" উপরে বসিয়াছিলে, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পার কি ?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদী গরীব গৃহস্থ মাত্র। তাঁহার বাড়ীতে ভাল আস্‌বাব আয়োজন বড় কিছু নাই। তবে আমরা পাঁচজনে গিয়া মাঝে মাঝে বসি ও গল্প গুজব করি। যখন টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তখন আমরা কিসের উপর বসিয়াছিলাম, যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমায় বলিতে হয় যে—শতরঞ্চীও বলা যায়, আবার মাদুরও বলা যায়। কেন না, শতরঞ্চীখানা এমন টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল যে, আমাদের চার-পাঁচজনের মধ্যে কেহ হয় ত শুধু মাদুরে বসিয়াছিল, কেহ হয় ত একটুখানি শতরঞ্চীও পাইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মাবতার! হুজুর! সে স্থানে শতরঞ্চীও বলা যায়, মাদুরও বলা যায়।

আসামীর পক্ষীয় উকীল আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কোন সময়ে এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল ? 'রাত্রিতে' না 'দিনমানে' ?" উকীলের মনে হইয়াছিল, এইবার এই সাক্ষী জব্দ হইবে।

সাক্ষী। আজ্ঞে, সময়টা—রাত্রি বলিলেও হয়, দিবস বলিলেও বলা যায়।

এই উত্তর শুনিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির! আসামীর পক্ষের উকীলের আর উপায় নাই। তথাপি ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি রকম ? খুলিয়া বল।"

সাক্ষী। আজ্ঞে, টাকাটা যখন আসামীকে দিবার জন্য আনা হইয়াছিল, তখনও দিন ছিল। কিন্তু কার্য্য শেষ হইতে রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে সময়টাকে দিনও বলা

যাইতে পারে, রাত্রিও বলা যাইতে পারে। তবে যে, যে ভাবে গ্রহণ করে, ধর্ম্মাবতার!

বিচারপতি ত অবাক্! সেখানে যতগুলি লোক ছিল, তাহারাও অবাক্! উকীল এবং আসামীর চক্ষুস্থির!

নির্দ্দোষ আসামীর উকীল-খরচা গেল। ৭৫৲ টাকা অনর্থক অর্থদণ্ড হইল। লোকের নিকট প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইলেন। আর ফরিয়াদী বক্ষ ফুলাইয়া—"কলিতে অধর্ম্মেরই জয়," —এই ভাবিয়া গর্ব্বভরে প্রস্থান করিল। বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, আবার কাহার বক্ষে ছুরিকা বসাইবে।

হায় বিধাতঃ! এ পাপীর কি দণ্ড নাই? "আছে।" অন্তরাত্মা বলিতেছে, "অবশ্যই আছে।" তবে তাহাই হউক—সামান্য ৭৫৲ টাকার জন্য সে একজন নির্দ্দোষের মনে যে প্রকার ক্লেশ দিল, সে যেন তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্লেশ ভোগ করে। পণ্ডিতগণ! বলিতে পারেন কি, এই সকল লোকের জন্য ধর্ম্মরাজ কি প্রকার নরক নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

সমাপ্ত।

রমণী-রহস্য

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিন্দু

বিন্দু গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ, যখন বিন্দুর বয়স পনের কি ষোল, তখন আমি বিন্দুকে চিনিতাম, কিন্তু গোয়ালিনী বলিয়া চিনিতাম না; কারণ তখন সে দুধের ব্যবসা করিত না, রূপের ব্যবসা করিত—রূপের ডালি লইয়া পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইত—লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিত এবং খাবদ্দার পাইলে তাহাকে আপন রূপের পরিচয় দিতে বসিত।

বিন্দুর এরূপ ব্যবসা কেহ জানিত না, কারণ তাহার সে ব্যবসার "লাইসেন্স" ছিল না, সেই হেতু পাড়ার লোকে বিন্দুর সুখ্যাতি করিত, আদর করিত। বিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে বসিবার আসন পাইত। কিছুদিন পরে বিন্দুর ব্যবসাটি ভাঙ্গিয়া গেল—কালের দুরন্ত করলে বিন্দুর ব্যবসায় লোকসান হইল—তাহার রূপের ডালিখানি ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিল, সুতরাং বিন্দুকে দুধের ব্যবসার জন্য রাজদ্বারে "লাইসেন্স" লইতে হইল।

এতদ্ব্যতীত বিন্দুর আর একটি ব্যবসা ছিল। সে পদ্মফুলের মৌমাছি ধরিয়া বেড়াইত; প্রত্যহ সকাল বেলা দুধের কেঁড়ে

লইয়া লোকের বাড়ীতে যোগান দিতে যাইত, এবং যে পদ্মিনীর মৌমাছিটী উড়িয়া গিয়াছে, বিন্দু তাহার পায়ে সুতা দিয়া ধরিয়া আনিত।

যাহা হউক বিন্দুর রূপের ব্যবসা ছিল বলিয়া পাড়ার চতুর ছেলেরা তাহাকে দেখিলে ব্যঙ্গ করিয়া তাহার ব্যবসার কথা জিজ্ঞাসা করিত; বিন্দু চিবুকে হাত দিয়া হেলিতে দুলিতে চলিয়া যাইত, কখন বা কাহারও পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধার করিয়া দিত।

আমার সহিত বিন্দুর কোন মৌখিক আলাপ ছিল না, যাহা কিছু বলিবার থাকিত, তাহা আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতাম, শুদ্ধ বিন্দু আসিলে আমি তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিতাম; আমি যতবার বিন্দুকে দেখিতাম, ততবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা হইত। সংক্ষেপতঃ আমি মনে মনে বাসিগোলাপের সৌন্দর্য্যের সহিত বিন্দুর রূপের তুলনা করিতাম, কিন্তু বয়োধিক্য ও আমার স্ত্রীর সহিত তাহার যথেষ্ট প্রণয় ছিল বলিয়া বিন্দুকে কোন কথা বলিতাম না, বিন্দুও আমাকে দেখিলে কোন কথা না বলিয়া অধরপ্রান্তে একটু হাস্য করিয়া চলিয়া যাইত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমার পত্নীর সহিত বিন্দুর এত হৃদ্যতা কেন? সে কি আমার পত্নীকে মৌমাছি ধরিয়া দিত? এ কথার উত্তর কে দিবে? হয় ত পাঠক মহাশয় দিতে পারেন; তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বিবাহের পর হইতে আমার স্ত্রীর সহিত চিরবিচ্ছেদের সম্বন্ধ ছিল, বোধ হয়, শুভদৃষ্টির সময় কোন শ্রীকৃষ্ণের সহস্রধারী সতী আমাদিগের দৃষ্টির ব্যাঘাত দিয়া থাকিবেন, সংক্ষেপতঃ বলিতে কি সেই শুভদৃষ্টির পর হইতে আজ পাঁচ বৎসরকাল একদিনের জন্যও আমি তাহাকে দেখি নাই।

আমার স্ত্রী আমাকে বশীভূত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, অনেক প্রকার শিকড়-মাকড় প্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু আমার অগ্নির এরূপ তেজ যে, আমি সে সমস্ত হজম করিয়া ফেলিয়াছি, হতভাগিনী অবশেষে নিরাশ হইয়া আমার জন্য আর কোন উপায় করিত না; তাহার আশারূপ অনন্ত—অসীমসাগরে প্রণয়রূপী যে তরীখানি ভাসিতেছিল, তাহা জলমগ্ন হইয়া গেল।

এক দিবস আমার স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছে। আমি বহির্ব্বাটীর একটি ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে বিন্দু আসিয়া গোপনে আমাকে ডাকিল। আমি সে সময়ে "মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতেছিলাম; বিন্দু আমাকে ডাকিয়াছে—কাহার সাধ্য রোধে? আমি বিশ্ববিজয়ী "মেঘনাদকে" বগলে করিয়া বিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

বিন্দু আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "ছোট বাবু, তোমার কি রকম রীতি? সমর্থ পরিবার—তাহার প্রতি চাও না, আর আমি বুড়ো মাগী, বাড়ী আসিলে আমার পানে এমন করিয়া চাহিয়া থাক কেন? আমি তোমার দুইটি চোখ গালিয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "বিন্দু! তার চেয়ে যদি তুমি আমাকে মারিয়া ফেল, তাহা হইলে ভাল হয়।"

বিন্দু উত্তর করিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "চোখ গালিলে তোমাকে দেখিব কিসে?"

বিন্দু কোন কথা বলিল না, পশ্চাদ্দিকে একবার চকিতভাবে চাহিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

আমি বলিলাম, "বিন্দু, যাইও না, তোমার সহিত আমার কথা আছে। তুমি নাকি পদ্মফুলের মৌমাছী ধরিয়া দাও ?"

বিন্দু বলিল, "সুবিধা পাইলে আপনিও ধরিয়া রাখি।"

আমি বলিলাম, "বিন্দু! আমাকে ধরিয়া রাখ না কেন ?"

"ধরা না দিলে কাহাকে ধরিব ?"

এই বলিয়া বিন্দু যাইবার উদ্যোগ করিল।

আমি বলিলাম, "বিন্দু, দাঁড়াও—দাঁড়াও, যাইও না, আমি কাল সন্ধ্যার সময় তোমার বাড়ীর পার্শ্বে গিয়া ধরা দিব, তুমি আমাকে ধরিও।"

বিন্দু সে দিবস আর কোন কথা কহিল না, অধরপ্রান্তে সুমধুর মন্দ হাস্য করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইনি কে

বিন্দুর বাড়ী আমাদিগের ছাপাখানার পার্শ্বে একটি গলির ভিতর ছিল। পর দিবস সন্ধ্যার পর আমি সেই গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বিন্দুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; অনেকক্ষণ দাঁড়াইলাম, কিন্তু বিন্দু আসিল না; মনে করিলাম, বিন্দু বুঝি আমাকে ফাঁকি দিল, নতুবা এখনও আসিল না কেন ?

আমি এইরূপ দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে বিন্দু আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমি তোমাকে আমাদিগের

বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ; কিন্তু আমার কাছে তোমাকে একটি সত্য করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "কি ?"

বিন্দু উত্তর করিল, "তোমার স্ত্রীর সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ, তোমাকে বাড়ী লইয়া যাইতেছি—আমার মাথা খাও, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

আমি বলিলাম, "বিন্দু, তুমি কেন সামান্য বিষয়ের জন্য অনর্থক আমাকে মাথার দিব্বি দিলে! আমি কি আমার স্ত্রীর প্রতি কখন চাহিয়া থাকি ?"

বিন্দু উত্তর করিল, "তবে আমার সঙ্গে এস।"

এই বলিয়া বিন্দু আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল।

বিন্দুর বাড়ী আমি পূর্ব্বে কখন যাই নাই, এখন প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার বাড়ীর তিন পার্শ্বে তিনটী খোলার ঘর ও সম্মুখের মৃণ্ময় প্রাচীরের মধ্যভাগে একটি প্রবেশ-দ্বার। যাহা হউক, আমি যাইবামাত্র বিন্দু তাহার মেয়েটীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাবিনি, বাবুর জন্য একটু তামাক সাজিয়া আন।"

আমি যে সময়ে বিন্দুর ঘরে গিয়া তাহার পালঙ্কে বসিয়াছিলাম, সে সময়টি সন্ধ্যাকাল, সেইজন্য ঘরটি অন্ধকার ছিল। বিন্দু ঘরে চাবি দিয়া বাহিরে গিয়াছিল বলিয়া ঘরে সন্ধ্যা পড়ে নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে বিন্দুর মেয়েটি অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তামাক সাজিয়া ফুৎকার করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল।

আমি বিন্দুর মেয়েকে পূর্ব্বে দেখি নাই—এই আমার প্রথম দেখা। সেই অন্ধকারে থাকিয়া কলিকার ফুৎকারোচ্ছ্বসিত আলোকে যাহা দেখিলাম, তাহা আর কখন দেখি নাই, বা

দেখিব না। বিন্দুর মেয়েটি গৌরবর্ণ, কিন্তু সে সময় আগুনের আলোকিত আলোকসংযোগে তাহার মুখখানি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের ন্যায় বোধ হইল।

যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে বিন্দু আমার ঘরে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে বলিল, "ভাবিনি, বাবুর জন্য যে দুধ জ্বাল দিয়া রাখিয়াছি, একটা বাটী করিয়া লইয়া আয়।"

আমি মনে মনে করিলাম, বিন্দু আমাকে এত যত্ন করিতেছে কেন। যাহা হউক, আমি তাহার মন বুঝিবার জন্য বলিলাম, "বিন্দু, আর অধিকক্ষণ আমি থাকিব না—বাড়ী যাই।"

বিন্দু বলিল, "সেকি বাছা? তুমি আমার বাড়ীতে কখন আইস নাই, আমি কখনই তোমাকে অম্‌নি মুখে যাইতে দিব না।"

বিন্দুর মুখে এই বাৎসল্যব্যঞ্জক সম্বোধন শুনিবামাত্রই আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। ভাবিলাম, বিন্দু আমাকে নৈরাশসাগরে ফেলিয়া দিল। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবিনী একটি পাত্রে দুধ এবং দুইটা পান লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আমি প্রথমে অন্ধকার বলিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই, এক্ষণে তাহাকে দেখিলাম। অধিক লিখিলে পুস্তক বাড়িয়া যাইবে, সংক্ষেপে বলিতে কি, তাহাকে একবার দেখিয়া আমার আশা পূরিল না, যতক্ষণ সে গৃহে উপস্থিত ছিল, ততক্ষণ কৌশলে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। বিন্দু সে কৌশল দেখিয়াছিল কি না, তাহা জানি না; ক্ষণপরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিন্দু, তোমার এই মেয়েটির কোথায় বিবাহ দিয়াছ?"

বিন্দু বলিল, "বাছা, সে কথা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, আজ পাঁচ বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সোয়ামী কিরূপ তাহা জানিল না। অভাগীর বেটা যে কোথায় চাকরী করিতে গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ নাই।"

এই বলিয়া বিন্দু গৃহ হইতে চলিয়া গেল; অনুমানে বুঝিলাম, বিন্দু তাহার মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইল।

আমি অনেকক্ষণ বিন্দুর ঘরে বসিয়া রহিলাম, বিন্দু চলিয়া গেলে পর ভাবিনীও সভয়ে আর একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী বসিয়া রহিলাম—কেহই আমার নিকটে আসিল না, অবশেষে নিরাশ হইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম। যাত্রাকালে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলাম, "বিন্দু, ঘর খোলা রহিল—আমি যাইতেছি।"

পরদিন অপরাহ্নে আমি সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে বিন্দু আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তুমি কাল আমার ঘর খুলিয়া আসিয়াছিলে, বাক্স হইতে আমার পাঁচটি টাকা চুরি গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "বিন্দু, তুমি কি বল? আমি ভদ্রসন্তান, আমাকে ওরূপ অপবাদ দিও না। যদি তোমার কিছু টাকার আবশ্যক থাকে—দিতেছি।"

এই বলিয়া আমি তাহাকে পাঁচটি টাকা দিলাম।

বিন্দু পুলকিত হইয়া বলিল, "তোমার সোনার দোয়াত কলম হউক, কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য—তুমি চোর।"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম, "বিন্দু! তুমি কি বলিতেছ ?"

বিন্দু উত্তর করিল, "চোর নহে ? তবে কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে গিয়াছিলে কেন ? আমি ত তোমাকে চুরি করিবার সন্ধান বলিয়া দিই।"

এতক্ষণের পর আমি তাহার বাক্যের মর্ম্মটি বুঝিতে পারিলাম, এবং বলিলাম, "বিন্দু, চোরেরা আগে সন্ধানীকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করে, সেইজন্যই ত আমি তোমাকে পাঁচটি টাকা দিলাম।"

বিন্দু আর কিছু বলিল না, শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আমার বাড়ীতে যাইবে ত ?"

আমি কিঞ্চিৎ ভারী হইলাম; সন্ধ্যার পর যাইবার ইচ্ছা রহিল, এই বলিয়া উত্তর দিলাম। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছিয়া সন্ধ্যার জন্য বিলম্ব সহিল না, পূর্ব্বাহ্নেই গিয়া বিন্দুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

এইরূপে আমি বিন্দুব বাড়ীতে প্রত্যহ যাওয়া আসা করি, বিন্দু প্রত্যহই আমার জন্য বাটী করিয়া দুধ রাখিয়া দেয়, এবং ভাবিনীকে দুধ ও পান দিতে বলিয়া বাড়ী হইতে সরিয়া যায়। আমিও পূর্ব্বমত নিরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসি।

এইরূপ বিন্দু প্রত্যহই আমার মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিল—হৃদয়বহ্নি জ্বালাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু কোন উপায় হইল না।

আজি আমি সন্ধ্যার পর বিন্দুর বাটীতে আসিলে সে বাড়ী হইতে যাইল না, আমাকে তাহার কন্যার ঘরে বসাইল। আমি ঘরের ভিতরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে বিন্দু রেকাবে করিয়া

প্রায় চারি আনার খাবার এবং দুধ আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। আমি আহারকালে মনে মনে করিলাম, যে দিবস বিন্দুকে যে পাঁচটী টাকা দিয়াছিলাম, আজি তাহার চারি আনা শোধ লইলাম।

যাহা হউক, আমার আহারাদি হইলে বিন্দু আপন ঘরে গিয়া খিলটি আঁটিয়া শয়ন করিল; আমি ভাবিনীর ঘরে বসিয়া রহিলাম।

এক্ষণে বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ঝড় হইতে লাগিল। ভাবিনী এতক্ষণ ঘরের ভিতরে ছিল না, আমাকে ঘরে দেখিয়া দাওয়ার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। অবশেষে বৃষ্টির উৎপীড়নে অন্যত্র স্থান না পাইয়া অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া আমার ঘরের একপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আমি এই অবসরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম, "তুমি শ্বশুরবাড়ী যাও নাই কেন?"

ভাবিনী প্রথমতঃ কোন উত্তর করিল না, পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে কপালে হাত দিয়া দেখাইল, "বরাত!"

আমি বলিলাম, "ভাল, তোমার স্বামীর সহিত কখনও কথা কহিয়াছিলে?"

ভাবিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন?"

ভাবিনী কিছুই বলিল না, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আমি অনেক সাধ্যসাধনা করিলাম, "ভাবিনি, দেখ, তোমার মা আমাকে কত ভালবাসেন, তুমি আমার সহিত সেরূপ কর না কেন?"

এইবারে ভাবিনী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "টাকা।"

আমি বলিলাম, "ভাল তোমাকেও দিতেছি—তাহাতে আপত্তি কি?" বলিয়াই আমি ভাবিনীর পায়ের নিকট দশটি টাকা রাখিয়া দিলাম।

আমি টাকা কয়টি অর্পণ করিয়াছি মাত্র, এমন সময়ে বাটীর সদর দরজায় গুম্ গুম্ করিয়া আঘাত হইল।

বিন্দু আপনার গৃহ হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি তোমার বেয়াই বাড়ী হইতে আসিয়াছি—দরজা খুলিয়া দাও।"

পরক্ষণেই বিন্দু দ্রুতপদে আমাদের সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শশব্যস্তে আমার হাত ধরিয়া বলিল, "এস, শীঘ্র এস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়?"

বিন্দু বলিল, "গোয়াল ঘরে; তোমাকে একটা বড় খড়ের ঝোড়া মাথায় দিয়া বসাইয়া রাখিব।"

আমি বলিলাম, "অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ! বিন্দু তোমার মনে কি এই ছিল! ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া, কি খড়ের ঝোড়া মাথায় দিয়া বসিতে হইবে?"

"যে বের যে মন্ত্র—তুমি ত একবার বের মন্ত্র পড়িয়াছিলে, এখন একবার এ বের মন্ত্র পড়।" এইরূপ বলিয়া বিন্দু আমাকে তাহার গোয়াল ঘরে প্রবেশ করাইল ও একটা বড় ঝোড়া চাপা দিয়া বসাইয়া রাখিল; আমি স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

পরক্ষণেই বিন্দু সদর দরজার নিকটে গিয়া তাহার বৈবাহিকের পরিচারিকাকে আপন গৃহে লইয়া গেল ও তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল।

আমি এইরূপে বিন্দুর গোয়ালরূপ বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে দুইজন লোক আস্তে আস্তে আসিয়া সেইখানে প্রবেশ করিল। আমি মনে মনে করিলাম, ইহারা কে ? বোধ হয়, ইহারাও বিন্দুর বাটীতে আসিয়াছিল, হয় ত সম্বন্ধে আমার মাস্তুত ভাই হইবে। যাহা হউক, তাহারা প্রবেশমাত্রেই দুইজনে কি পরামর্শ করিতে লাগিল—আমি তাহার সমস্ত স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম না, শুদ্ধ এইমাত্র শুনিলাম, একজন বলিতেছে, "এই রাত্রে হাবড়া গ্রামে যাইতে হইলে তিন টাকা ভাড়া লাগিবে।"

আমি তাহাদিগকে কোন সাড়া দিলাম না—বরং আরও নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিন্দু তাহার ঘর হইতে ভাবিনীকে ডাকিয়া বলিল, "ভাবিনি, একবার আয়—শীঘ্র আয়, তোর কপাল ভেঙ্গেছে।"

আমি ভাবিনীর কথা কিছুই শুনিতে পাইলাম না। বিন্দু বলিতে লাগিল, "জামাইএর বড় অসুখ, আজ রাত্রেই তোমাকে ভবানীপুর যাইতে হইবে।" আমি এই পর্য্যন্ত শুনিলাম। যে দুই ব্যক্তি আমার সহিত গোয়ালে লুকাইত ছিল, তাহারা অন্ধকারে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল, আমিও সুবিধা পাইয়া খড়ের খোড়াটির ভিতর হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিলাম। যাইবার সময় মনে মনে করিলাম, আর এ পথ দিয়া চলিব না—নাকে খৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চুরি

বিন্দুর বাড়ী আর কোন শালা যায় ? ছিঃ ভদ্রসন্তান, মাথায় ঝোড়া দিয়া বসাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আমি এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞায় ছিলাম, কিন্তু পাঁচটা বাজিবার পরই মনটা বড়ই উদ্বিগ্ন হইল—বোধ হইল, যেন বিন্দু পায়ে যে সূতা দিয়া মৌমাছী ধরিয়া বেড়ায়, সেই সূতা আসিয়া আজ আমার পায়ে লাগিল, সুতরাং আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

বিন্দু ঘরের ভিতর কি করিতেছিল, তাহা আমি জানি না ; আমি যাইবামাত্র সে শশব্যস্তে গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিন্দু, ভাবিনীর সংবাদ কি ?"

বিন্দু উদ্বিগ্নচিত্তে উত্তর করিল, "কি জানি বাছা, কাল রাত্রে জামাই-এর অসুখ বলিয়া লইয়া গেল ; আজি আমি সেইজন্য সেখানে দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তাহারা যে ঘরখানিতে থাকিত, সেখানিও নাই।"

আমি বলিলাম, "বিন্দু, সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমি তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিতে পারিবে ?"

বিন্দু। কি ? বল না।

আমি বলিলাম, "তোমার বাড়ীতে কি কাল কেহ আসিয়াছিল ?"

বিন্দু বলিল, "না, কেহই না ; তবে কাল বেকালে দুইজন লোক আমার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতেছিল। তাহারা এখানে আসিতে চাহিল—আমি আসিতে দিই নাই।"

আমি বলিলাম, "তবেই হয়েছে—তাহারাই তোমার ভাবিনীকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

বিন্দু বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, "ওমা—সেকি গো ! এমন কথা ত কোথায় শুনিনে !"

আমি বলিলাম, "হাঁ বিন্দু—তাহারাই ভাবিনীকে হাবড়ায় লইয়া গেছে ; কারণ আমি যখন কাল তোমার গোয়ালে বসিয়া থাকি, তখন কে দুইজন লোক আস্তে আস্তে গোয়ালে ঢুকিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল। আমি তাহাদিগের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, শুদ্ধ এইমাত্র শুনিলাম যে, 'আজ রাত্রে হাবড়ায় যাইতে হইলে তিন টাকা ভাড়া লাগিবে।'"

আমার কথা শেষ হইতে-না-হইতে বিন্দু সজলনয়নে ও গদ্গদ বাক্যে বলিয়া উঠিল, "বাবা—আমাকে বাঁচাও, আমার ভাবিনীকে আনিয়া দাও, ভাবিনী তোমারই—আমি তোমাকেই দিব।"

আমি বলিলাম, "বিন্দু ভয় নাই—তুমি কাঁদিও না ; আমি তোমার অনেক দুধ খাইয়াছি, এইবার তাহা পরিশোধ করিব।"

এইরূপ বলিয়া আমি হাবড়া গ্রামে যাত্রা করিলাম। কিন্তু কোথায় যাই—কি করিয়াই বা ভাবিনীর সন্ধান পাই, এই চিন্তাই আমার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ

থাকিবে, আমি দুই-তিনদিনমাত্র ভাবিনীকে দেখিয়াছিলাম, ইহাতেই এত, না জানি, তাহার সহিত আলাপ হইলে কি করিতাম।

যাহা হউক, আমি হাবড়া গ্রামের অনেক স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথায়ও ভাবিনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। প্রথমে এক স্থানে গেলাম—সেখানি পর্ণকুটীর; ঘরটির রাস্তার দিকে একটি জানালা; মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, কতকগুলি লোক একত্রে বসিয়া গাঁজা খাইতেছে। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা বলিতে পারেন, এখানে বিন্দুর মেয়ে কোথায় আছে?"

তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "এখানে বিন্দু বিসর্গ নাই, বাবা! গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যাও।"

আমি তাহাদিগের কথায় কোন উত্তর না করিয়া কিয়দ্দূর গিয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁগা, তুমি বলিতে পার, কাল রাত্রি এগারটার সময়ে এ গ্রামে কাহারও বৌ আসিয়াছে কি না?"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ বাছা, কাল রাত্রে ঐ সম্মুখের বাড়ীতে একখানা পাল্কী আসিয়াছিল, ঐ একতলা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তত্ত্ব লও।"

আমি আশ্বস্ত হইয়া সেইদিকে গমন করিতে লাগিলাম ও তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বাড়ীটি জনমানবশূন্য, শুদ্ধ বাহিরের একটি ঘরে একজন অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোক বসিয়া পান সাজিতেছে। আমি সাহসে ভর করিয়া একেবারে তাহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসিলাম,

"হাঁগা বিন্দু গোয়ালিনীর জামাই কেমন আছে? আমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছে।"

স্ত্রীলোকটি প্রথমতঃ আমার কথা উড়াইয়া দিল, বলিল, "বিন্দু গোয়ালিনীর জামাই কে? কেহই নাই, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "সে কি! তুমি ও তোমার সহিত আরও দুইটি লোক গিয়া কাল রাত্রে তাহার মেয়েটিকে লইয়া আসিলে—আর আজ বলিতেছ, বিন্দু গোয়ালিনীর জামাই কে? কেহই নাই!"

তখন স্ত্রীলোকটি বলিল, "ওঃ! তুমি বৌঠাকুরাণীর মার কাছ হইতে আসিয়াছ, তাই বল! তিনি যে দুধ বেচিয়া গোয়ালিনী হইয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, তুমি এইখানে বস—আমি বাড়ীর ভিতর খবর দিই।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদিগের বাড়ী ভবানীপুরে ছিল, এখানে আসিলে কেন?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "এটি বাবুর মামার বাড়ী—ভাল কবিরাজ আছে বলিয়া এইখানেই আসিয়াছেন," বলিয়া পরিচারিকা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিলাম, আশ্চর্য্য নহে—বিন্দুর জামাইএর সত্যসত্যই অসুখ হইয়া থাকিবে। তবে সেই গোয়ালঘরে আমার সহিত যে দুইটি লোক লুক্কায়িত ছিল, তাহারা কে? এই বিষয়টি অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে পরিচারিকা বড় একখানা পাত্রে করিয়া আমার জন্য খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিল। আমি বলিলাম, "এ সমস্ত কেন? বাড়ীতে অসুখ।"

পরিচারিকা বলিল, "হলেই বা—তুমি কুটুম্ব বাড়ীর লোক—তাই বলে কি তোমার অনাদর হবে ?"

আমি তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে বসিলাম। আমি যে ঘরে আহার করিতে বসিয়াছিলাম, সে ঘরে আর কেহই ছিল না, শুদ্ধ আমি আর সেই স্ত্রীলোকটি ছিল ? চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, দরজার পার্শ্ব দিয়াও কেহ দেখিতেছে না। আমি সেইজন্য পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলাম, "তোমাকে যদি আমি দুইটি টাকা দিই, তাহা হইলে তুমি আমার একটি কাজ করিতে পার ?"

পরিচারিকা বলিল, "কি কাজ ?"

আমি বলিলাম, "তোমাদের বৌঠাকুরাণীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিতে পার যে, তোমাদের বিপিন বাবু আসিয়াছেন, আজ রাত্রে তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে চাহেন।"

পরিচারিকা বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, "ওমা ! সে কি কথা গো ! আমি কি তাঁহাকে এমন কথা বল্‌তে পারি !"

আমি বলিলাম, "তোমার ভয় নাই—তিনি আমাকে বিশেষ জানেন, আর তাঁহার সহিত আমার বিলক্ষণ হৃদ্যতা আছে, তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি বাপু এত কথা বল্‌তে পারব না, তবে যদি তোমার সহিত তাহার আলাপ থাকে, তা হলে আজ রাত্রে তাকে এইখানে পাঠাইয়া দিতে পারি, তুমি আজ রাত্রে এইখানে শুইয়া থাকিও।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা তাহাই করিব, কিন্তু তুমি কত রাত্রে পাঠাইয়া দিবে ?"

পরিচারিকা একটু ভাবিয়া বলিল, "সকলে নিশুতি হইলে আমি তাহাকে বলিব, কিন্তু তিনি আসিবেন কি না, তাহা আমি জানি না।"

আমি বলিলাম, "ভাল, তুমি একবার আমার কথাটি তাঁহাকে জানাইও—তাহা হইলে যাহা হয় হইবে।"

এইরূপ বলিলে পরিচারিকা আমার জন্য একটি বিছানা পাতিয়া দিল, আমি সেইখানে শয়ন করিলাম।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল—দশটা, এগারটা দুই প্রহর বাজিয়া গেল—আমার নিদ্রা নাই; শুইয়া শুইয়া কতই ভাবিতেছি; একবার ভাবিতেছি, "আমার ন্যায় নির্ব্বোধ এ জগতে কে আছে? কোথায় অমন সহর পরিত্যাগ করিয়া হাবড়ায় আসিয়া শুইয়া আছি। কাহার জন্য, তাহা কে বলিতে পারে? ভাবিনীর সহিত আমার অল্পদিনের সাক্ষাৎমাত্র—বিশেষ আলাপও নাই; তা তাহার স্বামীর ব্যরাম—মৃতপ্রায়; সেকি তাহাকে ত্যাগ করে আমার কাছে আসিবে, ইহা ত বোধ হয় না।" আবার ভাবিলাম, "না—ভাবিনী সে প্রকারের লোক নয়—ভদ্রলোক, বিশেষ আমার নিকট টাকা লইয়াছে, তাহাতে কি আমাকে নিরাশ করিতে পারে?" এইরূপ মনে মনে অনেক প্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে ঘরের দরজাটি খুস করিয়া নড়িয়া উঠিল। আমি মশারী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক অর্দ্ধেক ঘোমটা দিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছে; দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম—ভাবিনী। তখন শশব্যস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া শয্যায় লইয়া আসিলাম। ভাবিনী আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাবিনি, তোমার স্বামী কেমন আছেন ?"

ভাবিনী বলিল, "থাক্‌লেই কি, আর গেলেই কি ? আমি ত স্বোয়ামী থাকিতেও বিধবা !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

ভাবিনী। তা বই কি ? আরাম হইলে ত বিদেশে চলিয়া যাইবেন—তাহাতে আমার কি ?

আমি বলিলাম, "তবে তুমি আমার সহিত চলনা কেন ?"

ভাবিনী। কয়দিনের জন্য ?

আমি বলিলাম, "কেন ? যতদিন আমার এ দেহে প্রাণ থাকিবে।"

ভাবিনী বলিল, "তাহা সকলেই বলিয়া থাকে।"

আমি। না ভাবিনী, আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।

ভাবিনী। ছিঃ ! ও কথা বলিও না, তোমার ন্যায় পাপীর মুখে জগদীশ্বরের নাম করিলে তাঁহার নামের অপমান হয়।

আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "তবে—তবে কিসে আমাকে তোমার বিশ্বাস হইবে।"

ভাবিনী বলিল, "ভাল, সে কথা তখন পরে হইবে ; এখন তুমি আমাকে এখান হইতে লইয়া চল—কিন্তু আমি মার কাছে যাইব না।"

আমি বলিলাম, "কেন ?"

ভাবিনী। সেখানে দুইজন লোক আমার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে ; শুনিয়াছি, তাহারা সুযোগ পাইলে আমাকে চুরি

করিয়া লইয়া যাইবে। আমাকে আজ রাত্রে তোমাদিগের বাড়ীতে লইয়া চল, কাল তখন সকালে উঠিয়া আমার মার কাছে যাইব।

আমি বলিলাম, "ভাবিনী, সেকি! আমাদিগের গৃহস্থের বাড়ী, বিশেষ আমি বাড়ীর ভিতর শুইয়া থাকি, সেখানে তোমাকে কিরূপে লইয়া যাইব?"

ভাবিনী বলিল, "তবে আমি যাইব না।"

আমি মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলাম, "ভাল, তাহাই করিব, এখনি আইস।"

এইরূপ বলিয়া, আমি তাহাকে সেই রাত্রেই একখানি নৌকা করিয়া কলিকাতায় আনিয়া উপস্থিত করিলাম ও বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আস্তে আস্তে আমার শয়ন-গৃহে লইয়া গেলাম।

গৃহে ঢুকিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়াছিমাত্র, এমন সময়ে ভাবিনী ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি চীৎকার করি!"

আমি সভয়ে বলিলাম, "সেকি ভাবিনি—কর কি! বাড়ীর লোকে জাগিয়া উঠিলে সকলে জানিতে পারিবে যে!"

ভাবিনী "কার কি?" বলিয়া ভাবিনী চীৎকার করিতে উদ্যত হইল।

আমি বলিলাম, "ভাবিনী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিও না—সকলে জানিতে পারিলে কাল সকালে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না।"

ভাবিনী ক্রোধান্বিত হইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "তবে তুমি আমাকে এখানে আনিলে কেন? তুমি কি জান না যে, আমি গৃহস্থের বৌ—আমার কি এই কাজ!"

আমি বলিলাম, "আমার ঘাট হয়েছে—তুমি আস্তে আস্তে কথা কও—আর কখন আমি এ কাজ কব্‌ব না—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।" এইরূপ বলিয়া আমি তাহার পা ধরিতে গেলাম।

ভাবিনী কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া বলিল, "তোমার পায়ে ধর্‌তে হবে না—তুমি আমার সম্মুখে নাকে খৎ দাও যে, আর কখনও এমন কাজ কব্‌বে না; শুদ্ধ তাহা নহে—আমাকে লিখে দাও যে, আজ হতে আমি পরস্ত্রী মাতৃতুল্য জ্ঞান কব্‌ব।"

আমি বলিলাম, "ভাল তাহাতে যদি তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহাই করিতেছি।"

এই বলিয়া আমি তাহার অভিপ্রায় মত লিখিয়া দিলাম।

আমাদিগের লেখাপড়া হইয়াছে মাত্র, এমন সময়ে আমার গৃহের দ্বারে হঠাৎ গুম্ গুম্ করিয়া আঘাত হইল। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা?"

"দাদা, দরজা খুলে দাও—ছোট বৌ বাপের বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছে, তার কোন সন্ধান নাই; তোমার শ্বশুর বাড়ীর ঝী খবর দিতে এসেছে।"

তাহার কথা শেষ হইতে-না-হইতে ভাবিনী অকস্মাৎ দ্বারের নিকট দৌড়িয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল, পরক্ষণেই আমার কনিষ্ঠা ও আমার শ্বশুর বাড়ীর ঝী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ঝী ভাবিনীকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কোথায় গিয়াছিলে বাছা? আজ তিন-চারিদিন ধরে তোমার কত সন্ধান হচ্ছে।"

কনিষ্ঠা ভগ্নী। তাই ত বৌ দিদি? কোথায় গেছ্‌লে?

"তোমারই ভাইকে আন্‌তে গেছ্‌লেম," বলিয়া ভাবিনী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তখন ভাবিনী আমার দুইটি পা জড়াইয়া বলিতে লাগিল, "নাথ! আমি তোমার ভাবিনী নই—সেই চিরদুঃখিনী পত্নী। এক্ষণে দাসীর এই মিনতি যে, তুমি ভাবিনীকে যে চক্ষে দেখেছিলে ও জগদীশ্বরকে সাক্ষ্য করে তাহার কাছে যেরূপ আবদ্ধ হয়েছিলে, সেইরূপ আমার কাছেও হইও।

সমাপ্ত।

অভাগিনী

ক্ষুদ্র গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিধবা ও কন্যা

একটি বিধবার একমাত্র কন্যা ছিল। স্বামীর পরলোকযাত্রার পর তাঁহার হস্তে যৎকিঞ্চিৎ ছিল, কন্যার লালনপালনে তাহা ব্যয় করিয়া তিনি একপ্রকার নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাহার উপর কন্যার বিবাহের সময় গায়ের কয়খানি গহনা পর্য্যন্তও বিক্রীত হইয়া যায়। কন্যার নাম মনোরমা।

মনোরমা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; কিন্তু মুখশ্রী অতি সুন্দর। সামান্য গৃহস্থের ঘরেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। যত দিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ হয় নাই, ততদিন বিধবা আপনার অবস্থা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। বুদ্ধিমতী আপনার বুদ্ধি-বলে সে সকল যতদূর সাধ্য ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার বিবাহের দুই-দশ দিন পর হইতেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। এমন কি দুই-চারিমাসের মধ্যেই তাঁহার এমন অবস্থা ঘটিল যে, প্রতিদিনান্তে তাঁহার আহার জুটিত কি না সন্দেহ। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া বৈবাহিক মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি কমিয়া আসিতে লাগিল। ভয়—পাছে বিধবা পর্য্যন্ত তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়েন। সুতরাং বিবাহের পর দুইবার ব্যতীত মনোরমার অদৃষ্টে আর পিত্রালয়ে আসা ঘটে নাই। দুরবস্থায় পড়িয়াও

বিধবা একবার কন্যাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈবাহিক মহাশয় সে লোককে বাড়ীর দরজা হইতেই বিদায় করেন। আর বলিয়া দেন যে, "বিয়ান্‌কে বলিও যে, তাঁহার কন্যা এখানে বেশ সুখে আছে; তাঁহার কাছে তাহাকে কেন অসুখী করিতে পাঠাইব? তিনি নিজে ভিখারিণী —তাঁহার নিজের এক বেলার অন্ন-সংস্থান নাই; তিনি কন্যাকে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?"

বিধবা যখন লোকমুখে এই কথা শুনিলেন, তখন তিনি আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা অদৃষ্ট! অর্থহীন হইলে লোকে এমন করিয়াই অনাদর করে বটে! আমি এককালে রাজরাণী ছিলাম, আজ 'ভিখারিণী' হইয়াছি; লোকে ত বলিবেই! সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

এইরূপে কন্যা-দর্শনে নিরাশ হইয়া তিনি আকুল-নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী অপর দুই-একজন বিধবা স্ত্রী তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। কেহ বা মনোরমার শ্বশুর-শাশুড়ী ধরিয়া কত গালি দিলেন; কেহ বা কত উদাহরণ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বিধবার অশ্রুজল থামিল না। যাঁহারা প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি কহিলেন, "মিছা আমায় বুঝাইতেছ, বোন! পেটের একটা ছেলে নেই যে, আবার একদিন ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন! আমার এ দুঃখের অবস্থা এই রকমেই কেটে যাবে। কেউ দেখ্‌বে না—শুন্‌বে না, এই রকম করেই মাটির দেহ মাটিতে মিশিয়ে যাবে। আহা! মনু আমার ভাল থাকুক—ভগবান্ করুন, তাই দেখে যেন মর্‌তে পারি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাপিষ্ঠ

মনোরমার একজন দূরসম্পর্কীয়া খুল্লতাত ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি মন্দ। মদ এবং বেশ্যায় তাঁহার বিষয় অর্দ্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহা বাকী ছিল, তাহার আয়ও অন্ততঃ সালিয়ানা দুই সহস্র মুদ্রা। সুতরাং পল্লীগ্রামে তিনি একজন 'ধনী, মানী গুণী ও সম্ভ্রান্ত লোক' বলিয়া গণ্য ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার স্বভাব ভাল ছিল; কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগ হওয়া অবধি সে নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শে। শেষে তাঁহার এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, পাড়া-প্রতিবেশী যুবতী স্ত্রীলোকমাত্রেই তাঁহাকে দর্শন করিলেই পলায়ন বা লুক্কায়িত হওনের ব্যবস্থা করিত। মনোরমার বিবাহের পর তিনি তাহার মাতাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রথমে বিধবা তথায় যাইতে স্বীকৃতা হয়েন নাই। পরে ক্রমে তাহার অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল, তখন একদিন মনোরমার কাকা (রামরতন বাবু) নিজে আসিয়া বিধবাকে আপন বাটীতে লইয়া আসিল।

রামরতন বাবুর মনোরমার মাতাকে লইয়া যাইবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লম্পট, ব্যভিচারী, সদুদ্দেশ্য যে তাঁহার ছিল না, একথা সকলেই বিশ্বাস করিবে।

মনোরমার মাতার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। তিনি পরমা সুন্দরী। কিন্তু এই রূপই তাঁহার কাল। এই পোড়া রূপের জন্যই দুষ্টাভিসন্ধিপূর্ণ রামরতন তাঁহাকে সাদরে আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে বড় আশা ছিল যে, বিধবাকে আপনার হস্তগত করিবেন।

বিধবা ক্রমে ক্রমে এ সকলই বুঝিতে পারিলেন। নির্জ্জনে, নীরবে কত অশ্রুজল ফেলিলেন। কিন্তু কি করিবেন—কোন উপায় নাই। সে স্থান হইতে বহির্গত হইলে বৃক্ষতল ভিন্ন আর গতি নাই! তাই যতদিন সহ্য করিতে পারিলেন, ততদিন তথায় বাস করিলেন।

কিন্তু একদিন রামরতন বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া স্পষ্ট বলিলেন, "যদি তুমি আমায় আত্মসমর্পণ না কর, তবে আমার বাটী হইতে দূর হও; আমি কেন তোমার পালনভার বহন করিব?"

বিধবা সে সময়ে কোন কথা কহিলেন না—নীরবে সকলই সহ্য করিলেন। কিন্তু শেষে গভীরা রজনীযোগে রামরতন বাবুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন। দুইদিন অনাহারে—অনিদ্রায় ক্রমাগত চলিয়া আপনার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পাড়া-প্রতিবাসী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা কহিলেন না। নীরবে প্রাণের দুঃখ প্রাণে চাপিয়া আপনার গৃহে শয়ন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুণ্যবতী

রামরতন বাবু পরদিন প্রাতঃকালে যখন শুনিলেন যে, পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে ও হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—যেমন করিয়া পারেন, বিধবার সর্ব্বনাশ করিবেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন। চারিদিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে, মনোরমার মাতা তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে।

বিধবা যখন একথা শুনিলেন, তখন তাঁহার যে কি অবস্থা ঘটিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। পাড়া-প্রতিবাসী ঘৃণায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। দিনে দিনে সেবা ও চিকিৎসা বিহনে, তাঁহার রোগ পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল—তথাপি তাঁহার মুখে একটু জল তুলিয়া দিবার একজন লোক জুটিল না।

মনোরমার শ্বশুরালয়ে পূর্ব্বেই তাঁহার নামে মিথ্যাপরাধ রাষ্ট্র হইয়াছিল। এখন আবার এই অন্তিম অবস্থার কথাও তথায় পৌঁছিল। বৈবাহিক তথাপি পুত্রবধূকে প্রেরণ করিলেন না।

মনোরমা সকল দিকে নিরুপায় হইয়া স্বামীর পায়ে-হাতে ধরিল। বলিল, "আমায় উনি না পাঠান, তুমি একবার গিয়া

দেখিয়া আইস! মা আমার কেমন আছে, একবার তুমিই না হয় জানিয়া আইস!"

সুরেশচন্দ্র (মনোরমার স্বামী) মনোরমাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি একথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। লুকাইয়া শাশুড়ীকে দেখিয়া আসিলেন। যখন বুঝিলেন, শাশুড়ীর অন্তিম সময় উপস্থিত, তখন পিতার বিনা অনুমতিতেই মনোরমাকেও লইয়া গিয়া তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন।

বিধবা তখন কথা কহিতে পারিতেছেন না, তাঁহার বাঙনিষ্পত্তি রহিত হইয়াছে। মনোরমার কোলে মাথা রাখিয়া মনোরমার মুখের দিকে অবিরল চাহিয়া, অশ্রুধারা প্রবাহিত করিতেছেন।

রামরতন বাবু এই সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, একবার বিধবাকে দেখিতে আসিলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বিধবা তাঁহাকে দেখিয়া অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তুমি আমার নামে মিথ্যাপবাদ না রটাইলে, আমি মরিতাম না। এখনও তুমি পাঁচজনের সাক্ষাতে স্বীকার কর যে, আমার নামে মিথ্যাপবাদ দিয়াছিলে। নহিলে জানিও, নরকেও তোমার স্থান হইবে না—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

অনুতাপানলে রামরতন বাবুর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই স্বীকার করিলেন। বিধবাও তখন—"আ! মনু সুখে থাক্—ঐ কথা শোন্‌বার জন্যই আমি এতক্ষণ বেঁচেছিলাম—এমন সুখে মর্‌তে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

সমাপ্ত।

কুলকলঙ্কিনী

সত্যঘটনামূলক প্রশ্নোত্তর গল্প

প্রথম অংশ—প্রশ্ন।

১

"আর কেন ভাই! চিনেছি—চিনেছি!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখনও পিছনদিক্ হইতে প্রমদার চক্ষু ধরিয়া রহিলেন। প্রমদা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর কেন ভাই, চিনেছি—চিনেছি! কেন আর চোখ ধর—নগেন!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ তদ্দণ্ডেই অমনই চক্ষুর্দ্বয় ছাড়িয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "ওঃ!" পরক্ষণেই অমনই ত্বরিতপদে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা বলিতেছিল, "তুমি!" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহা আর না শুনিয়াই চলিয়া গেলেন। প্রমদা তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিল—তাহার সম্মুখেই এক বাধা—তাহার শ্বশুর মহাশয় উপরে উঠিতেছিলেন; সুতরাং লজ্জায় নতমুখ হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। স্বামী সিঁড়ী দিয়া তরতর নীচে নামিয়া গেলেন।

২

"ঐ দেখ—ঐ দেখ, মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে।" বিমলা জ্ঞানেন্দ্রনাথের কোলের কাছে বসিয়া তাহার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইল, "ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথও একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া দেখিলেন। বিমলা সুযোগ বুঝিয়া আবার বলিল, "আমি কি আর মিছে বলি? আমি প্রায়ই দেখে থাকি, তাই-ই বলি! তবে সম্পর্কটা খারাপ, তাইতে তুমি যা মনে কর! কিন্তু এখন ত আর কিছু বল্‌বার যো নেই—এখন ত সব চাক্ষুষ দেখ্‌লে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাজেই নিরুত্তর। এতদিন বিমলার সঙ্গে কতই তর্কবিতর্ক করিতেন—কথাটা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়াই দিতেন; কিন্তু আজ যে এ চাক্ষুষ ঘটনা! তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! এতদিন আমি কি পিশাচীর মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম। ধিক্ আমাকে!" পরক্ষণেই মনের আবেগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "বিমলা। বিমলা! ধিক্ আমাকে! এতদিন যদি আমি তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌তেম, তা হলে আমাকে আর এ পাপ নরকের পথে এতদূর অগ্রসর হতে হত না! হায় এতদিন আমি দুধকলা দিয়ে কালসাপিনীকে পুষ্‌লেম! দেবীজ্ঞানে পিশাচীপ্রেতিনীর সেবায় কাল কাটালেম। বিমলা! বিমলা! এখন আর এর উপায় কি? আমার ইচ্ছে কর্‌ছে, আমি এখনই গিয়ে ওকে

খুন করে ফেলে মনের এই দারুণ যাতনা থেকে অব্যাহতি লাভ করি।" এই বলিতে বলিতে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিমলা আর সে পাপময় দৃশ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের চক্ষে পতিত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর অনুতাপিত না করে—সেন এইরূপই তৎক্ষণাৎ সেই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে অমনই তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণেই মৃদুস্বরে কতকটা দুঃখের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, "এখন উতলা হবার সময় নয়! এখনও আমার কথা শোন! আমি যা বলি, তা শুন্‌লে এখনও উপায় হতে পারে। এতদিন শোননি বলেই ত এতদূর হয়েছে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দারুণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া বলিলেন, "বিমলা! আর যে শোন্‌বার সময় নেই!"

সময় আছে—অস্থির হয়ো না। অস্থির হলে কোন কাজই হবে না।' এখনও আমার পরামর্শ শোন, অবশ্যই ফল পাওয়া যাবে।'

এই বলিতে বলিতে হস্ত ধরিয়া বিমলা আবার তাঁহাকে বসাইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্‌গস্ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রমদা—পিশাচী!"

৩

স্বর্গীয় বিজয়রাজ বসু মহাশয় অতুলসম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সেই অতুলঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী—তাঁহার একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথ। বড়লোকের ছেলে

অল্প বয়সে পিতার সম্পত্তিরাশি প্রাপ্ত হইলে সাধারণতঃ যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, নগেন্দ্রনাথের এক্ষণে সেই অবস্থা। নগেন্দ্রনাথ রাত্রিতে বাড়ীতে আসেন না; বিষয়কর্ম্মের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। অষ্টপ্রহরই কেবল সেখানে পড়িয়াছেন। কেবল সময়ে সময়ে পয়সাকড়ির আবশ্যক হইলে এক-আধদিন বাড়ী আসেন মাত্র; নহিলে আর পায় কে? আহা—তাঁহার বিহনে তাঁহার স্ত্রী—বালিকা নগেন্দ্রবালার কি কষ্ট! বালিকা এখনও সংসাররঙ্গ বুঝিবার অবসর পায় নাই—এ কোমল বয়সে সংসারের বিষম কূটজাল ভেদ করিবে, তাহার সাধ্য কি? পরিপক্ক বয়সেই মানুষ যখন সে রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন কোরককোমল বালিকা তাহার কি বুঝিবে? তাই তার চোখে সদাই বিরহাশ্রুজল; তাই সে সদাই হতাশায় কাঁদিয়া আকুল। নগেন্দ্রনাথ তার দিকে একবার ফিরেও চাহেন না; সে কত বিনয় করিয়া কাঁদিয়া বলে "তুমি যেও না!" কিন্তু হায়! তা শোনে কে?

নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর পাশেই জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাড়ী। দুই বাড়ীই লাগালাগি। দুইটি বাড়ীরই কতকাংশ ত্রিতল এবং কতকটা দ্বিতল। তার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীটা সেকেলে ধরণেই কতকটা নীচু-নীচু; আর নগেন্দ্রনাথদের বাড়ীটা বেশ খোলতা—উঁচুতেও বড়। এমন কি জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীর দোতলার ছাদের উপর দাঁড়ালে নগেন্দ্রনাথদের ছাদ আরও প্রায় তিন-চারি হাত অধিক উঁচু বলিয়া বোধ হয়। যদিও দুইটি বাড়ীই পরস্পর সংলগ্ন, তথাপি এ ছাদ হইতে ও ছাদে যাইবার যো নাই। বিশেষ অনেককালের কথা সামান্য একটু জমি-

জরাৎ লইয়া নগেন্দ্রনাথের পিতার ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতার কি একটা দ্বন্দ্বকলহ হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাওয়া-আসার পাঠ অনেকদিন হইতেই উঠিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আজ বিমলা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে দেখাইল, রাত্রি দুপুরের সময় একখানি মই লাগাইয়া একটি স্ত্রীলোক তাঁহাদের ছাদ হইতে নগেন্দ্রনাথদের ছাদে উঠিতেছে। বলা বাহুল্য, তেতলার ঘরের জানালা দিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন।

চাক্ষুষ এ ঘটনা দেখিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর বাস্তবিকই স্থির থাকেন কি করিয়া ?

৪

পরদিন জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনটা এতই খারাপ হইয়া রহিল যে, তিনি আর দিনমানের মধ্যে বিমলার ঘর হইতে বাহির হইলেন না। বিষাদে, মনঃক্ষোভে সমস্ত দিনই তাঁহার অতিকষ্টে কাটিয়া গেল। পিতা ডাকিলেন, "জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ভাত খাবে এস।" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "শরীরটা কেমন কেমন কর্‌ছে, আজ আর খাব না।" যাই হোক, অনেক করিয়া সন্ধ্যার সময় বিমলা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে একটু জল খাওয়াইতে পারিয়াছিল।

তার পর আবার রাত্রিতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজ প্রমদাকে হাতে হাতে ধরিবেন—এমনই যোগাড়যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। আর ধরিতে পারিলে প্রমদাকে যে তখনই টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবেন, এমনই তাঁর মনের রাগ।

কিন্তু হায়, ঘটনাও বুঝি তাই ঘটে! প্রমদা ছাদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন—কি জানি, কাহার প্রতীক্ষায় যেন পথপানে

চাহিয়াছিলেন। এমন সময়ে পিছন হইতে আর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিদারুণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন, "পাপিনী—পিশাচী!"

প্রমদা অমনই হঠাৎ চমকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "স্বামি! আমায় ক্ষমা করুন—আমি আপনার চরণে কি অপরাধে——"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর শুনিতে পারিলেন না। অমনই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া প্রমদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি সজোরে এক লাথী মারিলেন। "মা গো" বলিয়া হতভাগিনী প্রমদা সেইখানেই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবারও পদোত্তোলনের চেষ্টা করিতেছেন; এমন সময়ে যেন উপর হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বিমলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "ছি ছি! কর কি? অত উতলা হলে চলে কি? এস—এস—উপরে এস! আমার কথা শোন!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ফিরিতে হইল। প্রমদাকে একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বিমলার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে বিমলার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। প্রমদা সেই ভাবে অনেকক্ষণই সেই ছাদের উপর পড়িয়া রহিল।

৫

দুই-তিনদিন ধরিয়া বাড়ীতে বড়ই গণ্ডগোল। পিতা বলেন, "আজই বেটীকে বাড়ী থেকে দূর করে দেও—না হয়, জ্ঞানেন্দ্রের আর একটা বিয়ে দেব!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথের দয়াবতী জননীই কেবল তাহাতে বাধা দেন ; বলেন, "ছোট বউ যে সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী ! আমি ওকথা নিজের চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে !"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র তাহাতে বলেন, "বিশ্বাস না করেন, না করুন ; আমি কিন্তু আর এ কালামুখ দেখাতে পারিনে ! আমি অবশেষে আত্মহত্যা হয়ে মর্‌ব।"

পিতা বলেন,—"আমি আগেই ত বলেছিলাম—বেটী ছোট-লোকের মেয়ে, ওকে নিয়ে ঘরকন্না করা কোন কালেই চল্‌বে না। নইলে, দেখ্‌লে না, ওর বাপ-বেটা, পণের অবশিষ্ট সামান্য শতখানেক টাকার জন্য কি না ফেরেববাজী কর্‌লে ! যাই হোক, ও বেটীকে আজই বাড়ী থেকে দূর করে দেওয়া যাক। আমি আর কারু কথা শুন্‌ছিনে। এমন সোনারচাঁদ ছেলে আমার—বেটীর জন্যে ভেবে ভেবে হাড়-মাস মাটি করে ফেলেছে—তবু তোমাদের সেদিকে চোখ নেই ? যাই হোক বাপু, তুমি ক্ষান্ত হও ; আমি আজই বেটীকে এখনই বিনোর মাকে দিয়ে চালান করে দিচ্ছি। ভয় কি বাবা, আমি আবার তোমার বিয়ে দেব !"

জননী কাঁদিয়া বলেন, "ছি-ছি ! ও কথা মুখে এনো না ! অমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওর প্রতি কি ও সব কথা ভাল দেখায় ? আমি বল্‌ছি, ও নির্দোষ ; তোমরা ওর প্রতি অমন অত্যাচার করো না গো—করো না !"

"আরে, রেখেদে তোর ভিট্‌কেল্‌মি ! ও সব কিছুই শুন্‌ছিনে ! অমন বউ কি আর ঘরে রাখ্‌তে আছে ? তোদের জ্বালায় শেষে এক-ঘরে হতে হবে না কি ?" কর্ত্তা, রুক্ষ-স্বরে এই বলিয়াই গৃহিণীকে দু-একটা গালিগালাজও দিয়া উঠিলেন।

পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও সেইভাব—বাড়ীর অপরাপর সকলের মুখেও সেই একই কথা। সুতরাং একমাত্র গৃহিণীর কথায় আর কি হইবে?

এমন সময়ে, তায় আবার এ কি সোনায় সোহাগা! ডাক-পেয়াদা বাড়ীতে একখানা চিঠী দিয়া গেল। আর ঝি সেই চিঠী-খানা আনিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতে প্রদান করিল। জ্ঞানেন্দ্র-নাথ, শিরোনামায় দেখিলেন—প্রমদার নাম। উপরে হস্তাক্ষরে লেখা আছে,—'বিষ্ণুপুর' অর্থাৎ প্রমদার বাপের বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে। এমন সময়ে তাঁহার পিতা বলিলেন, "দেখই না, বেটীর বাপের বাড়ীর সংবাদই বা কি? কুল-মজানে বেটীকে তা'হলে সেইখানেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক্!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথও অমনই রোষভরে পত্রখানি খুলিলেন। কিন্তু খুলিয়াই, এ কি—কেন চমকিয়া উঠিলেন! "রাক্ষসী—রাক্ষসী! তুই আমাদের এমন পবিত্র কুলে কালী দিতে বসেছিস!" উদ্বেগ-ভরে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন; উন্মত্তের প্রায়, প্রমদাকে পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য উত্থিত হইলেন।

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, "বাপু! একটু থাম—থাম। অত 'উতলা' হয়ো না। আমি যা হয়, এর একটা প্রতীকার কর্‌ছি।" এই বলিয়া তিনি নিজে সেই পত্রখানি একবার হাতে লইলেন; কিন্তু দেখিলেন—ওঃ! কি ভীষণ!—কি লোমহর্ষক! আস্তে আস্তে পড়িলেন,—

"প্রাণের প্রমদা

তোমার নির্যাতনের বিষয় শুনিয়া বড়ই মর্মাহত হইলাম।

কি করিব, উপায় নাই। থাকিলে এই দণ্ডে তোমাকে মুক্ত করিতাম। কিন্তু যাই হোক, আজ রাত্রিতে তুমি যেরূপে হউক —হয় ছাদের সৈ দিয়া, নয় পাছ-দুয়ার দিয়া, নয় রান্না ঘরের ভাঙা জানালা দিয়া—বাহির হইয়া আসিবে। সর্ব্বত্রই আমার লোক থাকিবে। একবার বাহির হইতে পারিলে আর ভাবনা——"

কর্ত্তা আর পড়িতে পারিলেন না। ক্ষোভে, বিষাদে, ক্রোধে তিনিও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। "বেটীকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়ে, তবে জল-গ্রহণ কর্‌ব।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এমনই প্রতিজ্ঞা হইল।

গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কোনই উত্তর নাই। হায়, তবে এখন উপায়?

৬

রমণী বিহ্বল হইয়া কাঁদিতেছে। অপরিচিত দেশে অপরিচিত বিকট দৃশ্যের মাঝখানে, অপরিচিত নূতন লোকের সহবাসে, হায়! আজ তাহার কি নিদারুণ যম-যন্ত্রণা! রুখ্যকেশ, ছিন্নবস্ত্র, জীর্ণদেহ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় লুটিতেছে। নয়নে স্পন্দন নাই, কর্ণশক্তি হ্রাসপ্রায়—মুখেও বাক্য সরে না! তবে যখন যন্ত্রণার একশেষ হইতেছে—আর সহ্য করিতে পারিতেছে না; এইমাত্র বলিতেছে, "বিনোর মা, ও কথা আমায় আর বলো না। সব কষ্ট সইতে পারি; কিন্তু বিনোর মা ও কথায় প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে!" আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখ ফুটিয়া

আর কোন কথাও নাই। কেবল বিনোর মা যেই 'সেই' কথা বলে, অমনই তাহার যন্ত্রণার বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া যায়।

হতভাগিনীর দিন এইরূপে কাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল অন্তরাল হইতে শুনিলে আর একটি কথা শুনা যায়। রমণী পাগলিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "নাথ! আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, আমায় এমন করিয়া এই প্রেত-পুরে ফেলিয়া গেলেন!" রমণী এইরূপেই আক্ষেপ করে, আর অবিরল ধারায় কাঁদিতে থাকে।

বিনোর মা মাঝে মাঝে বলে, "কেন কাঁদ আর বাছা! তারা যখন তোমায় বাড়ী থেকে ভুলিয়ে এনে, বেশ্যার ঘরে রেখে যেতে পার্‌লে, তখন আর কেন তুমি তাদের নাম কর? ভাব না কেন, তারা তোমার কেউ নয়-ই——"

"নয়-ই," শুনে রমণী আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। বিনোর মা বাধা দিয়া বলিল, "কেঁদে কেঁদে কেন শরীরটা মাটি কর বাছা! আমরাও যখন এসেছিলেম, আমাদেরও তখন প্রথম প্রথম অমনই কষ্ট হয়েছিল বটে; কিন্তু শেষ যখন বুঝ্‌লেম, কেউই কিছু নয়—নিজের যাতে সুখ হয়, তারই তল্লাস করা ভাল; তখন হতেই সব ভুলেছি! আর তাই দেখ, এখন কেমন সুখে আছি।"

প্রমদা আর সহিতে পারিল না; দারুণ কষ্টস্বরে বলিল, "বিনোর মা! ওসব কথা শোনার চেয়ে আমার গলায় কেন একটা ছুরি বসিয়ে দাও না! স্বামী অবশ্যই আমার কোন দোষ দেখেছিলেন, আর সে দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয় ত এই! তা বলে তুমি কেন আমায় অমনতর মর্ম্মজ্বালা দিচ্ছ! জেন বিনোর মা,

আমায় খেতে না দিলেও আমি বাঁচ্‌তে পারি, আমায় ধরে দু ঘা মার্‌লেও তা আমার সহ্য হয় ; কিন্তু বিনোর মা ও সব পাপ কথা আমায় আর শুনিও না ! তাঁদের নিন্দার কথাও আমার কাছে আর বলো না—ও নরকের পথেও আমায় আর টেন না ! বিনোর মা এর চেয়ে কষ্ট আর যে সইতে পারিনে !"

প্রমদা ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিনোর মারও মনে তখন সন্দেহ জন্মিল, "কেন তবে এমন হল !"

এ যেন গোলোকধাঁধা ! ব্যাপার দেখিয়া আমরাও চমকিত। এখনও ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না, "হায় ! প্রমদার কেন এমন হল !"

পাঠক ! আপনারা যদি কেউ কিছু জেনে থাকেন, আমাদের বল্‌বেন, কেন এমন হল ?

দ্বিতীয় অংশ—উত্তর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুলকলঙ্কিনী

"পার্‌বে না?"

"না।"

"পার্‌বে না?"

"না।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? আমিই না হয় ব'খে গিয়েছি, তা বলে এক অবলা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করব?"

মহেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের বাটীর পশ্চাদ্ভাগে খিড়কীর বাগানে লতামণ্ডপের মধ্যে নিভৃত স্থানে দাড়াইয়া একজন যুবক ও একজন যুবতী এইরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। জ্যোৎস্নালোকে তখন পৃথিবী হাসিতেছিল।

যুবতী কহিল, "ইঃ—এত ধর্ম্মজ্ঞান গা, তবে আমার সর্ব্বনাশটা কর্‌লে কেন? তখন অবলা স্ত্রীলোক বলে মনে পড়েনি? তখন আমাকে কুলবালা বলে বোধ হয়নি? তখন এত ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল?"

যুবক। না, তা হয়নি। তুমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডেকে এনেছিলে, পাপনয়নে আমার দিকে চেয়েছিলে, পাপমতিতে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলে, তাই আমি তোমার

সহিত গুপ্তপ্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেম; নচেৎ তুমি আমার কে—আমি তোমার কে? আমি পথের পায়রা, পথে এখানে-সেখানে উড়িয়া বেড়াই। অর্থের আবশ্যক হইলে বাড়ীতে আসি; নচেৎ সেইখানেই পড়িয়া থাকি। মাঝে হইতে তুমি কেন আমায় বাধিলে? কেন ধরা দিলে? মনে করিয়া দেখ, আমি তোমায় প্রথমে এ কাজে কত বাধা দিয়াছিলাম। মনে করিয়া দেখ, আমি তোমায় কত নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি কি এখন সব ভুলিয়া যাইতেছ?

যুবতী। নগেন! তুমি কি সেই নগেন? বল দেখি, তোমার প্রতি আমি কতদূর বিশ্বাস করিয়াছিলাম। তোমার নিকট হইতে আমি কত প্রত্যাশা করিয়াছিলাম? আজ তুমি আমায় নিরাশ করিলে?

যুবতী কাঁদিতে লাগিল। নগেনের মন তাহাতে গলিল। সে কিছু নরম হইয়া বলিল, "বিমলা! ছি, তুমি কেঁদে ফেল্‌লে। দেখ, আমি ত তোমায় কোন বিষয়ে নিরাশ করি নাই। তুমি আমার নিকট যখন যাহা চাহিয়াছ, তখনই তাহা দিয়াছি। তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসে না; আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি। তোমার জন্য কলঙ্কপসরা শিরে তুলিতেও স্বীকৃত হইয়াছি। সবই করিয়াছি, তোমার জন্য সবই করিতে পারি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, একটি অবলা বালিকার সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া তোমার কি ফললাভ হইবে?"

রোষভরে যুবতী কহিল, "তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—আমি অপাত্রে দেহ-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। দেখিব, একা কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না?"

রোষকষায়িতলোচনে একবার নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া দম্ভভরে বিমলা খিড়কীর দরজা দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। নগেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিরাশচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্রনাথ সিংহ গ্রামের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ লোক। পাঁচজনে তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করে। গ্রামের ভিতর তিনি একজন মুরুব্বিয়ানা ধরণের লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাধ করিয়া আবার তিনি তাহার দুই বিবাহ দিয়াছেন। বড় বধূর নাম বিমলা—সেই কুলকলঙ্কিনী সর্ব্বনাশীকেই আমরা প্রথমে পাঠকের সম্মুখে চিত্রিত করিয়াছি। বোধ হয়, সেইজন্য দুই-একজনের বিরক্তিভাজনও হইতে পারি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাপিনী-সতিনী

"কি করবো ভাই! একমনে বিধাতাকে ডাকি, আর নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই। আমার মা বাপ্ ত আর মন্দ দেখে বিয়ে দেন নি। অমন দশরথের মত শ্বশুর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী, রামের মত স্বামী, রাজ-রাজড়ার মত বিষয়-বিভব—আমার কিসের অভাব ছিল, ভাই! আমারই অদৃষ্টদোষে দেখ, শ্বশুর শাশুড়ী স্বর্গে গেলেন—স্বামী আমার প্রতি বিরূপ হয়ে, বারাঙ্গনার রঙ্গভঙ্গে উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লেন। বারবিলাসিনীর বাটীতে অবস্থান করা সুখকর বোধ কর্‌লেন—আমি এখানে

ভেবে ভেবে শরীর কালী কর্‌তে লাগ্‌লেম। হায়! সবই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

"বাস্তবিক তোর কষ্ট, আমার চেয়েও বেশী। আমি সতিনীর জ্বালায় পুড়ে মরি, তবু তাঁর পায়ে ধরে সাধি। কত গালি-গালাজ দেন, তবু তাঁকে বড় দিদির ন্যায় সম্মান করে থাকি। তাঁর অনেক প্রকার কুলকলঙ্কের কথা শুনিতে পাই, তবু তাহা ঢাকিয়া রাখি। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে, বাজে কথায় উড়াইয়া দি; কিন্তু তবুও তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যেন সদা-সর্ব্বদাই প্রস্তুত। স্বামীকে একদিন আমার গৃহে আসিতে দেখিলে, তিনি জ্বলিয়া উঠেন, আমি হাতে পায়ে ধরিয়া স্বামীকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিয়াও তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারি না। এত দুঃখ, এত কষ্ট, স্বামী-সুখে একেবারে বঞ্চিত, তথাপি বলি, ভাই! তুমি আমা অপেক্ষাও দুঃখিনী। কেন না, আমি তবু স্বামীকে দুই-এক রজনীর জন্য দেখিতে পাই—তুমি আবার তা'ও পাও না। আহা! তিনি যে কেন এমন হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে কত ভালবাস্‌তেন, এখন আর তার কিছুই নেই।"

মহেন্দ্রনাথ সিংহের ভবনে, দ্বিতল কক্ষে, রাত্রি এগারটার সময় দুইজন ষোড়শবর্ষীয়া, পূর্ণযৌবনা সরলা বালা এইরূপে আপনাপন মনদুঃখের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল। একজনের নাম প্রমদা, আর একজনের নাম নগেন্দ্রবালা। প্রমদা, মহেন্দ্রনাথ সিংহের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া দয়িতা। আর নগেন্দ্রবালা পার্শ্বস্থ বাটীর ৺দ্বিজরাজ বসুর, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথের

ভার্য্যা। দুইজনেই প্রায় সমদুঃখে দুঃখিনী, তাই দুইজনে এত ভাব। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন,—

"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,—
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

ব্যথার ব্যথী নাহিলে ব্যথা বুঝিবে কে? নগেন্দ্রবালা আর প্রমদায় তাই এত ভাব—তাই এত মেশামেশি। উভয়েই উভয়কে আপনার সুখ দুঃখের কথা জানায়, উভয়েই উভয়ের জন্য ব্যাকুল। প্রমদার কোন কথা নগেন্দ্রবালাকে না বলিলে তৃপ্তি হয় না। আবার নগেন্দ্রবালাও যে কোন কথাই হউক, প্রমদাকে না বলিয়া স্থির থাকিতে পারে না।

একদিন বা নগেন্দ্রবালা প্রমদার কক্ষে আসিয়া গল্প করিত, একদিন বা প্রমদা নগেন্দ্রবালার কক্ষে যাইয়া সুখ-দুঃখের কথায় সময় অতিবাহিত করিত। তবে যেদিন প্রমদা স্বামীকে পাইবার আশা রাখিত, সেদিন নগেন্দ্রবালার সহিত, সকাল সকাল পৃথক্ হইত। নগেন্দ্রবালা ও প্রমদা আকৃতিতে উভয়েই প্রায় সমান। এমন কি পশ্চাৎ হইতে দেখিতে, কে প্রমদা কে নগেন্দ্রবালা তাহা স্থির করা দুরূহ হইত।

প্রমদার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহাকে দিনকয়েক বড় ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সতিনী বিমলা ঈর্ষানলে প্রদগ্ধ হইয়া চারিদিকে এমনই ষড়যন্ত্র করিয়া প্রমদাকে অসতী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনও প্রমদার প্রতি কতকটা সন্দেহজনক ভাব ধারণ করিয়াছিল। যে সতিনীকে তুষ্ট রাখিবার জন্য প্রমদা, স্বামীর হাতে-পায়ে ধরিয়া, নিজ

সুখে জলাঞ্জলি দিয়াও জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বিমলার কক্ষে পাঠাইয়া দিত, সেই বিমলাই আবার সুবিধা বুঝিয়া স্বামীকে এই কথা বলিত—"তুমি ত আমার কথা বিশ্বাস করিবে না। তুমি মনে কর, সতিনী বলেই বুঝি বলি; কিন্তু তা নয়। প্রমদা মোটে তোমায় চায় না—তোমায় দেখ্তে পারে না। তাই ভাল-মানুষী জানিয়ে, তোমাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। মনে করে, কেউ কিছু বুঝ্তে পার্বে না—কিন্তু আমি যে সব জানি—আমার কাছে কি আর ও চালাকীটুকু খাট্‌বে? এদিকে ওর নগেনের উপর টান কত! এই ঘরে বসে আমি তোমায় দেখাতে পারি যে, ও মই দিয়ে আমাদের ছাদ থেকে ওদের তিন-চার হাত উঁচু ছাদে উঠে, রাত্রি দুপুরের সময়, নগেনের কাছে যাবার জন্য তাদের বাড়ী যায়।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া একদিন বলিলেন,—"তোমার কথা শুনে আমার বিশেষ সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু একদিন আমায় দেখাতে পার, তবে পুরো বিশ্বাস করি।"

বিমলা তাহাতে উত্তর করিয়াছিল, "তার আর ভাবনা কি? তোমায় যেদিন হ'ক, একদিন দেখিয়ে দেব। প্রমদা ও রকম রোজই প্রায় গিয়ে থাকে, একদিন আর তোমায় দেখাতে পার্‌বো না?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুখ দুঃখের কথা

যাহা হউক, এদিকে প্রমদা ও নগেন্দ্রবালার কথোপকথন সেইরূপই চলিতেছে।

প্রমদা বলিল, "দেখ ভাই! স্বামীর মনে কি জানি, কি একটা ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে আমায় যত ভাল-বাসিতেন, এখন আর তত ভালবাসা দেখিতে পাই না। যেন কেমন একতর হয়ে গিয়েছেন। সেদিন এই ঘরে আসিয়া তিনি পিছন হইতে আমার চোখ টিপিয়া ধরেন। আমি মনে করেছিলাম, বুঝি তুমি এসেছ। তাই, তোমাকেই মনে করে, বলেছিলাম, 'আর কেন ভাই! চিনেছি—চিনেছি! কেন আর চোখ ধর নগেন!' স্বামী তাইতেই এক প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'ওঃ!' তার পরেই রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে ত্বরিতপদে আমার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমার চোখ ছাড়িয়া দিবামাত্র আমি পিছন ফিরিয়া, জিব্‌ কাটিয়া বলিলাম,—'তুমি—' কিন্তু স্বামী তাহা না শুনিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম—কিন্তু সে সময় ঠাকুর উপরে উঠিতেছিলেন—কাজেই আর যাইতে পারিলাম না। তিনি সিঁড়ী দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। আর সেইদিন থেকেই আমার উপর তার বিরূপ ভাব। এখন বল

দেখি, ভাই! কেন স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কেন ক্রোধ-পরবশ হইয়া, নীচে চলিয়া গেলেন?"

নগেন্দ্রবালা। আমি যদিও কতকটা বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু তোমায় বল্‌তে আমার সাহস হয় না।

প্রমদা। কেন ভাই?

নগেন্দ্রবালা। পাছে তুমি কেঁদে-কেটে একশা কর।

প্রমদা। না—না আমি কাঁদ্‌ব না, তুমি বল।

নগেন্দ্রবালা নিশ্চয় জানিত, যদি সে প্রমদার কাছে, "জ্ঞানেন্দ্র-নাথের প্রমদার উপর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে," এই কথা বলে, তা হলে প্রমদা বোধ হয়, তখনই মূর্চ্ছা যাবে; কাজেই নগেন্দ্র-বালা কোন কথা বলিল না। মনে মনে ভাবিল, "এই অদৃষ্ট-দোষে পিতৃকুলে আমার কেহই নাই, অকালে শ্বশুর শাশুড়ী পরলোক গত হইয়াছেন, স্বামী বেশ্যাপরবশ হইয়াছেন। আবার যে প্রমদার সঙ্গে একসঙ্গে বসি দাঁড়াই—একসঙ্গে অনেকটা সময় অতিবাহিত করি—আজ শুদ্ধ আমারই অদৃষ্টদোষে, আমার নাম ধরিয়া ডাকার দরুণ, সন্দেহে সন্দেহে বুঝি বিষময় ফল উৎ-পন্ন হয়। আমারই অদৃষ্টদোষে, বুঝি সরলা প্রমদার সর্ব্বনাশ হয়! হায় প্রমদা! কেন তুমি শুধু 'নগেন' বল্‌লে? 'নগেন্দ্রবালা' বা 'নগেনবালা' বল্‌লে ত তোমার স্বামী কিছু সন্দেহ কর্‌তেন না।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ, উত্তরোত্তর বিমলার প্ররোচনায় বাস্তবিকই এমনই হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পাতাটি নড়িলে, কুটোটি পড়িলে, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয়, ঐ বুঝি কে আসিতেছে! ঐ বুঝি, কুলকলঙ্কিনীর কলঙ্ককাহিনী লইয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধ-

বনিতা আন্দোলন করিতেছে। ঐ বুঝি, প্রমদা নগেন্দ্রনাথের বাটীতে যাইতেছে।

নগেন্দ্রবালা নিজে প্রমদার সমস্ত ঘটনা বুঝিয়াও কিছু প্রকাশ না করিয়া কহিল, "আজ চল্‌লুম ভাই—তোমার ঘটনাটি বড় খারাপ হয়েছে—বোধ হয়, এই থেকেই তোমার কপাল ভাঙ্‌তে পারে। এখনও উপায় আছে—এখনও স্বামীর মন্ নরম করিতে পারিলে তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার ভ্রম-বিশ্বাস তিরোহিত হইবে। কাল আর আমি আসিব না। তুমি এই ছাদের উপর সিঁড়ীর কাছটিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। যেই স্বামী উপরে উঠ্‌বেন—অমনই একেবারে তাঁহার পায়ে জড়িয়ে পড়্‌বে। আর বল্‌বে—'নাথ। আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, আমায় এত অনাদর করেন? যদি না জানিয়া কোন অপরাধ করিয়া থাকি, আমায় তিরস্কার করুন, আমি আর কখনও তাহা করিব না।' এইরূপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় তাহার মন যৎ-কিঞ্চিৎ নরম হইলে, তাঁহাকে ঘরে লইয়া গিয়া প্রথমে বন্দী করিবে, তার পর তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারিলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু দেখিও, লজ্জা, মান, অভিমান সকল বিষয় ত্যাগ করিয়াও এই কাজটি আজ করিতে চাও—নাহলে তোমার ভারি বিপদ্।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নগেন্দ্রবালা একবার ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় বারটা বাজে। কাজেকাজেই তাড়াতাড়ি করিয়া প্রমদার নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

* * * *

পাশাপাশি দুইটি বাড়ী। একটি মহেন্দ্রনাথ সিংহের ও

অপরটি শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর। নগেন্দ্রনাথের বাড়ী হালফেশানে নির্ম্মিত, তাই মহেন্দ্রনাথ সিংহের বাটী অপেক্ষা প্রায় তিন-চারি হাত উচ্চ। দুইটি বাড়ীরই কতকাংশ দ্বিতল এবং কতকাংশ ত্রিতল। মহেন্দ্রনাথ সিংহের বাড়ীর দ্বিতলের ছাদে দাঁড়াইলে, নগেন্দ্রনাথের ছাদ আরও প্রায় তিন-চারি হাত উচ্চ বলিয়া বোধ হয়; তবে নগেন্দ্রবালা একখানি ছোট মই কিনিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই, তাহাদের উভয়ের যাতায়াতের এত সুবিধা হইয়াছিল। এইরূপে দুই সখীতে প্রতিদিনই প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরাবধি সুখ দুঃখের কথায় সময় অতিবাহিত করিত। তার পর উভয়ে পৃথক্ হইত। কথোপকথনও শেষ হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাক্ষুষ-দর্শন

"ঐ দেখ, ঐ দেখ, মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে।"

বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথের কোলের কাছে বসিয়া তাহার ঘরের জানালার ফাঁক দিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইতেছে, "ঐ দেখ, ঐ দেখ, ঐ মই নিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে।"

বিমলা বড় জাঁক করিয়া স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিল, "তার আর ভাবনা কি! তোমাকে যেদিন হ'ক, একদিন দেখিয়ে দেবো। প্রমদা ও রকম রোজই প্রায় গিয়ে থাকে। একদিন আর তোমায় দেখাতে পারব না।"

প্রমদার দুরদৃষ্টবশতঃ বিমলার সর্ব্বনেশে অভিসন্ধি এইবার পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইল।

নগেন্দ্রবালা, ঘটনাক্রমে সেইদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রমদার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র মই লাগাইয়া তাহাদিগের ছাদে উঠিতেছিল। বিমলা দেখাইল,—"ঐ দেখ—ঐ দেখ—মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে।"

প্রমদা ও নগেন্দ্রবালা দেখিতে প্রায় একরকম, বয়সও উভয়ের প্রায় সমান। কাজেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ, রাত্রিতে ত্রিতলের কক্ষে বসিয়া অত-শত বুঝিতে পারিলেন না।

কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া, রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রমদার উপর তাঁহার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। বিমলার কথা, বিমলা একপ্রকার প্রমাণ করিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাবিলেন—"নিশ্চয়ই প্রমদা দ্বিচারিণী।"

বিমলা সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "আমি কি আর মিথ্যে বলি? আমি প্রায়ই দেখে থাকি, তাই-ই বলি। তবে কি না সতিনী সম্পর্কটা বড় খারাপ, তাইতে তুমি যা' মনে কর; কিন্তু এখন ত আর কিছু বল্‌বার যো নাই—এখন ত সব চাক্ষুষ দেখ্‌লে?"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাজেই নিরুত্তর। এ ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়া কি বলিয়াই বা আর বিশ্বাস না করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! এতদিন আমি কি পিশাচিনীর মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম! ধিক্ —ধিক্—আমাকে! এতদিন যদি আমি তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌তেম, তা হলে আমাকে আর এ পাপ নরকের পথে এতদূর অগ্রসর হতে হত না। হায়! এতদিন আমি দুধ কলা দিয়ে কি কালনাগিনীকে পুষ্‌লেম! দেবীজ্ঞানে পিশাচী প্রেতিনীর সেবায় কাল কাটালেম। বিমলা! বিমলা! এখন আর এর

উপায় কি ? আমার ইচ্ছে কর্‌ছে, আমি এখনি গিয়ে ওকে খুন করে ফেলে, মনের এই দারুণ যাতনা হতে অব্যাহতি লাভ করি ।"

এই বলিয়া তিনি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

বিমলা ভাবিল, "যদি স্বামী এখনই উঠিয়া যান, তাহা হইলে এত কৌশল, এত ষড়যন্ত্র, সকলই ব্যর্থ হইবে। কারণ তিনি দেখিবেন, প্রমদার পরিবর্ত্তে নগেন্দ্রবালা মই দিয়া উঠিতেছে ; আরও দেখিবেন, অসতীত্বের পরিবর্ত্তে সতীত্বের আধার, গৃহলক্ষ্মী প্রমদা তাহার নিজকক্ষেই বসিয়া স্বামীর জন্য ভাবিতেছে—চির-বিষাদময়ী প্রতিমাখানি একমাত্র স্বামীর ধ্যানে নিমগ্ন আছে। কাজেই বিমলা জানালা বন্ধ করিয়া অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সেদিনকার মত আপনার কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "প্রমদা—পিশাচী !"

বিমলা কহিল, "তুমি ভাবিতেছ কেন, ও কুলকলঙ্কিনীকে বাটী হইতে কলকৌশলে দূর করিয়া দাও। বিনোর মা খুব ধড়ীবাজ মেয়ে মানুষ, তাকে কিছু টাকা দিলেই সে ওকে দেশ-ছাড়া করে রেখে আস্‌তে পার্‌বে। অবশ্য তোমায়ও তাহার সহায়তা করিতে হইবে।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কহিলেন, "একেবারে অতদূর করা হইবে না —আগে আর একদিন দেখি ।"

বিমলা এ কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল না। তবে স্বামীকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল, আর তিনি প্রমদার কক্ষে যাইবেন না। কারণ দর্শাইল, "যে অসতী, সে কুকার্য্যের খাতিরে স্বামীহত্যাও করিতে পারে।"

পরদিন জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনটা এতই খারাপ হইয়া রহিল যে, তিনি দিনমানে আর বিমলার কক্ষ হইতে বাহির হইলেন না।

* * * * *

বিনোর-মা নামক জনৈক 'বৃদ্ধা-বেশ্যা-তপস্বিনী' আজকাল সর্ব্বদাই জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীতে আসিত। তাহার মুখমিষ্টতা ও পরোপকারিতা দর্শনে লোকে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ ভুলিয়া গিয়াছিল। আজকাল বিমলার সহিত তাহার বড় প্রণয়। নগেন্দ্রনাথের সহিত বিমলার অঘটন সংঘটন, তাহারই দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

গ্রামের কাহারও কন্যা, পুত্রবধূ, স্ত্রী প্রভৃতিকে কুলের বাহির করিতে হইলে উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণ অর্থবিনিময়ে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিত। সে-ও কে কি রকম স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহা চিনিতে পারিত। বিনোর মার বয়স আন্দাজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, কিন্তু রংটা তার এখনও কুটকুটে। ঠোঁট দুখানি এখনও সদাই টুকটুকে। যাই হোক, পাড়ায় বাহির হইতে হইলে, সে আর এখন সে কালের মত বাহার দিয়া বাহির হয় না—এখন তার ভোলটা অনেকটা ফিরিয়াছে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, তার হাতে হরিনামের ঝুলি—কপালে রসকলি। কাজেই লোকে আর তাহাকে বিশ্বাস না করিবে কেন? অথচ সেই মোহেই এ পর্য্যন্ত সে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে। কুলবধূকে ব্যভিচারিণী করা—অর্থ বিনিময়ে তাহাকে কুলের বাহির করিয়া আনা, অথবা গোপনে নায়ক নায়িকার মিলন সংঘটন বিনোর মার একটি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। যাহাদিগের আবশ্যক, তাহাদিগের তাই সে সকল বিষয়ে অদ্বিতীয়া বিনোর মার সাহায্য

গ্রহণ করিতে হইত। বিনোর মার সেটাও একটা ব্যবসার মধ্যে। গ্রামে বিনোর মার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইত—কিন্তু তাহার কথার মিষ্টতায় সকলে এত মোহিত—রোগী রোগশয্যায় বিনোর মার সেবায় এত পরিতুষ্ট—বাড়ীতে কোন একটা কাজকর্ম্ম হইলে বিনোর মার বুক দিয়া খাটায় লোকে এত আনন্দিত যে, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিলেও তাহা উড়িয়া যাইত—কেহ গ্রাহ্য করিত না; বরং বিনোর মাকে সকলেই আদর-যত্ন করিত। কিন্তু বিমলা এহেন বিনোর মাকেও ঠকাইয়াছিল। সে বিনোর মার এমন বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছিল যে, প্রমদার চরিত্রে গলদ আছে, এবং তাহাকে বাটী হইতে বিদূরীত করিতে না পারিলে সংসারের আর মঙ্গল নাই। নগেন্দ্রনাথের সহিত নিজ কলঙ্ককাহিনীর ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

নগেন্দ্রনাথের সহিত বিমলার মিলনে বিনোর মার উভয় পক্ষেই লাভ ছিল। যেদিন সে নির্ব্বিঘ্নে উভয়ের মিলন করাইয়া দিতে পারিত, পরদিন উভয়ের নিকট হইতেই দু-চার টাকা করিয়া পাইত। কাজেকাজেই বিনোর মা সে লোভ ছাড়িতে পারিল না। সে প্রমদার সর্ব্বনাশসাধনে বিমলার সহায় হইল।

বিনোর মা সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিমলার সহিত-সাক্ষাৎ করিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষ বিমলা বলিয়া দিল, "তবে তুমি কেবল ঐ কর্ম্ম কর—তা হলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে। এই পত্রখানা, ওঁর আর কর্ত্তার হাতে এসে পড়তে পারলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। পত্রে ঠিকানা থাকিবে "বিষ্ণুপুর"—প্রমদার বাপের বাড়ীর ঠিকানা। লেখা পুরুষের

হইবে—লোকটাকে দাঁড় করাইবে নগেন্দ্রনাথ। বামী দাসীকে আমি ঠিক তাকে তাকে থাক্‌তে বলেছি। ডাকপিয়ন এসে চিঠীখানি বাড়ীতে দিয়ে যাবে, অমনি সে এসে সে পত্র ওঁর হাতে দেবে। আর তা হলেই কাজ ফর্‌সা!"

বিনোর মা মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল, "কেন গো! এই নগেনের জন্য প্রাণ ফেটে যায়—আর এর মধ্যেই এত রাগ কেন?"

বিমলা রোষকষায়িতলোচনে কহিল, "নগেন আমার ভারি অপমান করেছে—আমি সেদিন এত করে বল্‌লেম, আমার একটা কথা রাখ্‌লে না—আমি এক ঢিলে দুইটা পাখী মার্‌ব।"

বিনোর মা একবার ভাবিল, নগেনের সহিত বিমলার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া আপনার লাভের পথ বন্ধ করিবে কি না? তার পরেই স্থির করিল যে যখন বিমলার নগেনের উপর মন চটিয়াছে, তখন আর পুনর্মিলনের চেষ্টায় কাজ নাই—বরঞ্চ নূতন নাগর আনিয়া দিতে পারিলে অধিক লাভ হইলেও হইতে পারে।" কাজেই সে আর কিছু না বলিয়া সেই কথায় স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। বিমলা আরও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

বিমলা স্বামীর নিকট আসিল। স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর সেদিন গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। অধিক বেলা হইয়াছে দেখিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিলেন। তিনি—"শরীরটা কেমন কেমন কর্‌ছে, আজ আর কিছু খাব না,' এই কথা বলিয়া কাটাইয়া দিলেন। শেষে বিমলার অনুরোধে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জালপত্র

নগেন্দ্রবালার সহিত পরামর্শানুসারে সরলাবালা প্রমদা পরদিন দ্বিতলের ছাদে সোপান-শ্রেণীর কাছাকাছি স্বামীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে। আহা! অবলা ঘুণাক্ষরেও জানে না যে, কি প্রকারে তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র হইতেছে—কি প্রকারে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে তাহাকে স্বামীর হৃদয় হইতে দূরে ফেলিতেছে।

*　　　*　　　*　　　*

এদিকে বিমলার ষড়্‌যন্ত্রে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজ প্রমদাকে হাতে হাতে ধরিবেন—এমনই যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। আর ধরিতে পারিলে, প্রমদাকে যে তখনই টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবেন, এমনই তাহার মনের রাগ; কিন্তু হায়! ঘটনাও বুঝি তাই ঘটে। প্রমদা ছাদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়াছিল। এমন সময়ে, পিছন হইতে, আর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ্ নিদারুণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন, "পাপিনী—পিশাচী!"

প্রমদা অমনি হঠাৎ চমকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "স্বামী! আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনার চরণে কোন্ অপরাধে—" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর শুনিতে পারিলেন না। তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি যেন দারুণ মর্ম্মান্তিক যাতনায়, ভীষণ ক্রোধে অধীর হইয়া, দৌড়াইয়া আসিয়া, প্রমদার

প্রতি লক্ষ্য করিয়া সজোরে এক পদাঘাত করিলেন। "মা গো," বলিয়া হতভাগিনী প্রমদা সেইখানেই পড়িয়া গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবার প্রহারের জন্য পদোত্তোলন করিতেছিলেন, কিন্তু বিমলা দৌড়াইয়া আসিয়া (পাছে বাড়ীতে একটা খুন হয় ও সকলকে বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে) স্বামীকে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "ছি ছি—কর কি!"

বিমলার অনুরোধে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। আর প্রমদা—প্রমদা সেইখানেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

* * * *

পর দিন কথাটা রীতিমত প্রকাশ হইয়া গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কুলকলঙ্কিনীকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তবে জলগ্রহণ করিবেন।" জ্ঞানেন্দ্রনাথের মাতা বিমলার অসচ্চরিত্রের বিষয় কিছু কিছু আভাসে জানিতেন, কিন্তু প্রত্যক্ষে কখনও কিছু দেখেন নাই বলিয়া, সে কথা কিছু উত্থাপন না করিয়া, বারবার কহিতে লাগিলেন, "ছি-ছি! ওকথা মুখে এনো না। অমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওর প্রতি কি ওসব কথা ভাল দেখায়? আমি বল্‌ছি, ও নির্দোষ; তোমরা ওর প্রতি অমন অত্যাচার করো না গো—করো না!"

সে কথা শুনেই বা কে—সকলেই প্রমদার বিপক্ষে। জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও সেই ভাব! একা গৃহিণীর কথায় আর কি হইবে।

এমন সময়ে একি সর্ব্বনাশ! ডাকের পেয়াদা আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল। আর ঝি

সেই চিঠীখানি আনিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের হস্তে প্রদান করিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেখিলেন—পত্রখানি প্রমদার নামে—তাহা 'বিষ্ণুপুর' অর্থাৎ প্রমদার পিত্রালয় হইতে আসিতেছে; কিন্তু তাঁহার পিতা বলিল, "দেখ নাই কেন, বেটীর বাপের বাড়ীর খবরটাই বা কি?" জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাই পত্রখানি উন্মোচন করিলেন, কিন্তু ওঃ কি ভীষণ! কি লোমহর্ষণ! দেখিলেন, পত্রখানি ত প্রমদার বাপের বাড়ী হইতে আসে নাই—পত্রখানি যে নগেন্দ্রনাথ লিখিতেছে;—

"প্রাণের প্রমদা!

তোমার নির্যাতনের কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কি করিব, উপায় নাই—থাকিলে এই দণ্ডেই তোমায় মুক্ত করিতাম। কিন্তু যাই হ'ক্, আজ রাত্রে তুমি যেরূপে হউক, হয়, ছাদের মই দিয়া, নয়, পাছদুয়ার দিয়া, নয় রান্নাঘরের ভাঙ্গা জানালা দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। সর্ব্বত্রই আমার লোক থাকিবে। একবার বাহির হইতে পারিলে আর ভাবনা——"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর পড়িতে পারিলেন না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কর্ত্তাও তখন একবার পত্রখানি পড়িতে গেলেন, কিন্তু তিনিও আর পড়িতে পারিলেন না। পত্রখানি খুলিয়াই, তাঁহার মন আরও ক্রোধে ও বিষাদে জ্বলিয়া উঠিল—অভাগিনী প্রমদাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। চুপি চুপি স্থির হইল, কালীঘাট যাওয়ার নাম করে তাকে বাড়ীর বার করা হবে। বিনোর মাকে অর্থ-প্রদানে স্বীকৃত করিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিজে প্রমদাকে ছলে ভুলাইয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। বিনোর মা দাসীর ন্যায় সঙ্গে গেল। পরামর্শ

থাকিল, প্রথমে বিনোর মা ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দুই জনেই প্রমদার সঙ্গে কিয়দ্দুর যাইবে, তার পর পাশ কাটিয়ে চলে এলেই চল্‌বে। নইলে শুধু বিনোর মার সঙ্গে যেতে হলে, সন্দেহ করিতে পারে। যদি তাতে না যায়, তবেই ত গোল। তাই স্থির হইল—ভুলাইয়া কালীঘাট দেখানর ছলে, প্রমদাকে কোন এক বেশ্যালয়ে রেখে আসা হবে। আর তাহা হইলেই সকল ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যাইবে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এক গাড়ীতে যাইবেন, আর প্রমদা ও বিনোর মা আর এক গাড়ীতে যাইবেন; কাজে-কাজেই তাঁহার গাড়ী যদি কোন একটা পাশ রাস্তায় ঢুকিনা পড়ে এবং প্রমদা ও বিনোর মা যে গাড়ীতে থাকিবে, সে গাড়ী যদি সটান সোজা চলিয়া যায়, তাহা হইলে কি প্রমদা আর তাহা বুঝিতে পারিবে? রাস্তায় কত লোকের গাড়ী যাইতেছে, কত গাড়ী মোড় ফিরিতেছে, কে কাহার গাড়ী চিনিয়া রাখিয়াছে বল। কাজেই প্রমদা যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের পাশ কাটান বুঝিতে পারিবে না, একথা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইল।

যখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সতীকে ছলে ভুলাইয়া তাঁহার সহিত যাইবার কথা বলিলেন, তখন আর প্রমদা স্বামীর সঙ্গে যাইতে দ্বিরুক্তি করিল না, বরং যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্বামীর সঙ্গে তীর্থযাত্রায় যাইতে তাহার বাধা হইবে কেন? স্বামী আদর করিয়া ডাকিলেন, হাসিয়া কথা কহিলেন, প্রমদা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। কোথায় যাইতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না।

বিমলার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল। সন্দেহজনক পত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও কর্তার হাতে আসিয়া পড়াতে প্রমদার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিতে এইরূপই হয়

হায়! এই ষড়যন্ত্রে আজ প্রমদার এই দুর্দ্দশা! স্বামী বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সেইখানে ফেলিয়া গিয়াছেন, আর অভাগিনী প্রমদা সেই অপরিচিত ভীষণ দৃশ্যের মাঝখানে পড়িয়া কাঁদিতেছে। নূতন লোকের সহবাসে—হায়! আজ তাহার কি নিদারুণ যমযন্ত্রণা। রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ দেহ, প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় লুটিতেছে। আর আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে, "নাথ! আমি কোন্ অপরাধে—ইত্যাদি।"

বিনোর মা পাশে বসিয়া তাহাকে মন্ত্রণা দিতেছে, "কেন তাহাদিগের জন্য তুমি ভাবিয়া মর? তোমার স্বামী যখন তোমায় বেশ্যার ঘরে ফেলে রেখে যেতে পার্‌লে, তখন কেন আর তুমি তাদের নাম কর—তাদের ভুলে যাও। আমরা যখন প্রথমে এসেছিলাম, আমাদের এমনই কষ্ট হয়েছিল—এখন কেমন সুখে আছি। বুঝে দেখ, সংসারে কেউ কারও নয়, নিজের সুখই সুখ। মনে কর, তোমার কেউ নেই—কখনও কেহ ছিল না।"

প্রমদা চীৎকার করিয়া বলিল, "তুই এমন পিশাচী, তা আমি জানিতাম না। না জানি, তুই এইরূপে কত অবলার সর্ব্বনাশ করেছিস্!"

বিনোর মা "হাঃ হাঃ" করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বিদ্রূপপূর্ণ হাসি প্রমদার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে আঘাত করিল।

প্রমদা দারুণ যন্ত্রণায় কষ্টস্বরে কহিল, "বিনোর মা। ও সব কথা শুনানর চেয়ে আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেল না কেন। যদি স্বামী আমায় পরিত্যাগ করিলেন, তবে দাও, আমায় বিষ এনে দাও, আমি আর কার জন্য এ দেহভার বহন করব? স্বামীর উপর সন্দেহ আমার নাই---নিশ্চয়ই পাপ ষড়যন্ত্রে আমার এ দুর্গতি হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি না বুঝে-সুঝে সীতার স্থায় আমায় বিসর্জ্জন দিয়েছেন। বিনোর মা। তোমায় আমি মিনতি করে বল্‌ছি, তুমি ও সব পাপ-কথা আমায় আর শুনিও না। না খেয়ে যদি মৃত্যু ঘটে, বজ্রাঘাতে যদি ব্রহ্মস্থল ভেদ হয়, তথাপি সতী কখনও স্বামীর নিন্দা সহ্য করিবে না, সতী কখনও কুপথে গমন করিবে না।"

তার পর ক্রমেই প্রমদা অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন বিনোর মারও মনে মনে সন্দেহ হইল, "বিমলা কি তবে সত্যসত্যই সতিনীর হিংসায় এমন সতী লক্ষীর সর্ব্বনাশ করিল?"

প্রকৃতই ইহা একটি গোলক-ধাঁধা! ব্যাপার দেখিয়া সকলকেই চমকিত হইতে হয়। আমরা কোন ছার। হায়! সর্ব্বনাশীর ষড়যন্ত্রে সরলা স্বাধ্বী সতীর সর্ব্বনাশ হইল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, "প্রমদার কেন এমন হইল," আমরা বলিব, "কুলকলঙ্কিনীর কল কৌশলে কলিতে এইরূপই হয়।"

সমাপ্ত।

সর্ব্বনাশিনী

ভৌতিক কাহিনী

তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয় দেখিবার ইচ্ছা বহুকাল হইতে আমার হৃদয়ে নিতান্তই বলবতী ছিল, তাহাই আমার চিরসহচর প্রাণের বন্ধু প্রবোধচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমি একদিন দার্জ্জিলিং রওনা হইলাম।

আমরা পথে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়েরই মত যে, রেলে গেলে হিমালয় প্রকৃতভাবে দেখা হইবে না। রেল যেন উড়িয়া যায়, এরূপ অবস্থায় রেলে গমন করিলে হিমালয়ের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকৃত উপলব্ধি করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। এইজন্য আমরা উভয়ে স্থির করিলাম যে, আমরা শিলিগুড়ি হইতে পদব্রজে দার্জ্জিলিং রওনা হইব।

সকালে শিলিগুড়ি উপস্থিত হইলাম। যতক্ষণ দার্জ্জিলিংএর সুন্দর ক্ষুদ্র গাড়ীগুলি দৃষ্টিপথে রহিল, ততক্ষণ ষ্টেশনে আমরা তাহার বিচিত্রগতি দেখিতে লাগিলাম। তৎপরে দুই কুলির মস্তকে আমাদের দুইজনের দুই ট্রাঙ্ক চড়াইয়া দিয়া নিজ নিজ হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া বাজারের দিকে চলিলাম।

পথেই দুই-একটি বাঙ্গালীর সহিত দেখা হইল। আমরা বাজারেই বাসা লইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা করিতে দিলেন না। জোর করিয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। আমরা যাঁহার বাড়ীতে উঠিলাম, তিনি এখানে শাল-কাঠের ব্যবসায় করেন।

সেদিন সে রাত্রি আমরা শিলিগুড়িতেই রহিলাম। সকলেই আমাদিগকে বলিলেন, "পাহাড়ে হাঁটিয়া যাইতে ভারি কষ্ট হইবে, বরং গরুর গাড়ী করিয়া যান। আমরা পদব্রজে যাওয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, প্রকাশ্য সদর রাস্তা দিয়া যাইব না। তাহাও স্থির, সে রাস্তায় বহু লোক চলাচল করে, বহু গরুর-গাড়ী মাল লইয়া সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে, অধিকন্তু তাহারই পার্শ্ব দিয়া রেল গিয়াছে। সুতরাং এ রাস্তায় হিমাচলের স্তব্ধ-গম্ভীর সৌন্দর্য্য উপভোগের সুবিধা হইবে না, সুতরাং আমরা সে পথে প্রাণ থাকিতে যাইব না।

যে পথে পাহাড়িয়াগণ চলা-ফিরা করে, সেই ক্ষুদ্র অপরিসর পথ দিয়া আমরা যাইব, তবে পাহাড়ের পথ দুর্গম, তাহাতে আমরা পথ চিনি না, সুতরাং আমাদের একজন পথ প্রদর্শক আবশ্যক।

অর্থে কি না হয়? আমাদের নূতন বন্ধুদিগের অনুগ্রহে, আমরা তাহাদের একজন বিশ্বাসী মহাবলবান্ ভুটিয়া পথ-প্রদর্শক পাইলাম। সে তাহার তিনজন বিশ্বাসী কুলি সংগ্রহ করিল। পরদিবস অতি প্রত্যুষে কুলির মস্তকে দ্রব্যাদি দিয়া ভগবানের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

প্রথমে আমাদের অগ্রে কোমরে দুই খক্‌রী, হস্তে এক বৃহৎ লগুড়, ভুটিয়া থম্বিমেনা। তৎপশ্চাতে আমরা দুইজন, তৎপশ্চাতে তিনজন কুলি। আমরা মহানন্দা নদীর পোল পার হইয়া মাটিয়া খোলার হাট উত্তীর্ণ হইলাম, তৎপরে নক্সাবাবীর পথ ধরিয়া চলিলাম।

পথে এক কাইয়ার দোকান পাইয়া তথায় রন্ধন ও ভোজন কার্য্য সারিয়া লইলাম। এই দুর্গম জঙ্গলেও মাড়োয়ারী মহাত্মা-দিগের অভাব নাই, মধ্যে মধ্যেই দোকান, দোকানে প্রায় সর্ব্ব দ্রব্যই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইলাম। আমাদের হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিবার এখানে উদ্দেশ্য নহে, নতুবা আমরা এই রূপের-শেখর শ্রীযুত হিমালয় মহাশয়ের রূপ বর্ণন করিবার চেষ্টা পাইতাম। সুতরাং আমরা এ কথার উত্থাপন করিব না।

এই হিমালয়ে এমন প্রায়ই ঘটে যে, কোথায় কিছু নাই, অকস্মাৎ কুয়াশা উত্থিত হইয়া চারিদিক্ আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় হইয়া যায়, তখন আর কিছুই দেখা যায় না—অতি কষ্টে, অতি সাবধানে পথ অতিক্রম করিতে হয়।

আমরা যে পথে যাইতেছিলাম, তাহা অতি দুর্গম—এক-দিকে অতলস্পর্শী খাদ, পড়িলে সহস্র হস্ত নিম্নে আসীন হইতে হয়। একজনের অধিক দুইজনে পাশাপাশি যাইবার উপায় নাই। অনেক সময়ে হাঁমাগুড়ি দিয়া কষ্টে উঠিতে হয়। অতি কষ্টে কুয়াশার অন্ধকার ঠেলিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এ দিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়--দারুণ প্রবল শীত, তাহার উপর বৃষ্টি। হিমালয়ে এই বৃষ্টি না থাকিলে বোধ হয়, ইহাই ইন্দ্রের অমরাবতী ও নন্দনকানন হইত। একটা মাথা রাখিবার স্থান পাইলেই আমরা তথায় আজিকার মত বিশ্রাম করি, নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কুয়াশার ভিতর দিয়া কোন্ দিকে যাইতেছি, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিতেছিল যে, নিকটেই কাহিয়ার দোকান ও বস্তি আছে, কিন্তু আমরা এক ঘণ্টা কষ্টে চলিয়াও কোন পল্লী পাইলাম না।

হিমালয়ের সন্ধ্যা আমাদের দেশের মত সহজ রকমে হয় না। সন্ধ্যা বলিয়া কোন ব্যাপার এখানে নাই। সহসা না বলিয়া-কহিয়া অবাধ্য মেঘের মত যেন একেবারে তিমিরবসনা নিশা হিমালয়কে নিজের কৃষ্ণাঞ্চলে ঢাকিয়া দেয়; আজ ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম, অনুভব করিলাম, সহসা চারিদিক্ ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল, আর কিছু দেখিবার উপায় নাই।

আমাদের পথ-পদর্শক উচ্চৈঃস্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে চলিল, আমরা তাহার গলার স্বর অনুসরণ করিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিলাম। একটু পা পিছলাইলেই গিয়াছি আর কি—ভয়াবহ মৃত্যু। এখন আমরা বুঝিলাম, আমাদের শিলিগুড়ির বন্ধুগণ হিতবাদী বটেন; কিন্তু মরণ কালেতে রোগী ঔষধ না খায়—গতানুশোচনায় আর ফল কি?

সহসা পথ-প্রদর্শক দাঁড়াইল, আমরাও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম! তখন বুঝিলাম, সে নিজেই অন্ধকারে পথ হারাইয়াছে—গ্রামের পথে না গিয়া অন্য পথে আসিয়াছে, দুর্গম

পাহাড়ের দুর্গমতম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—কোন্ দিকে কোথায় যাইবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। সে নিজে এ কথা স্বীকার না করিলেও তাহার গলার স্বরে এ কথা আমাদের বেশ উপলব্ধি হইতেছিল।

তখন আমাদের হৃদয়ের ভিতরে হৃদয় বসিয়া গেল; বুঝিলাম, রাত্রে এই পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল মধ্যেই আজ রাত্রি কাটাইতে হইবে। তাহাতে বড় কিছু যায়-আসে না—তবে পতিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ না হইলেই এক্ষণে ভগবানের অসীম দয়া।

থম্বিসেনা বলিল, "ফিরিয়া একটু এই পথে নামিয়া গেলেই একটা বস্তি পাইব।"

অগত্যা তাহাই করা শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমরা ফিরিলাম; কিন্তু কয়েকপদ যাইবামাত্র আমি একটা গড়ানে স্থানে আসিলাম, তাহার পর কি হইল, ঠিক মনে নাই। আমি গড়াইতে গড়াইতে কতদূর চলিলাম, তাহাও মনে নাই। এইমাত্র বুঝিলাম, আমার লম্বা কোট দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধুবর প্রবোধচন্দ্রও ঠিক আমার গতি অনুকরণ করিয়া আমার অনুসরণ করিতেছে, শব্দে বুঝিলাম, গুণবন্ত থম্বিসেনারও সেইরূপ দশা—গড়াইয়া আসিতেছে।

সহসা কিসে লাগিয়া আমাদের অধঃপতনের গতি বন্ধ হইল, স্পর্শে বুঝিলাম, কি একটা কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যে আমাদের বেগ নিরোধ হইয়াছে। পকেটে দেশলাই ও বাতী ছিল, জ্বালিলাম।

সেই অন্ধকারে দীপালোকেও ভাল দেখা যায় না।

আলোটা উচ্চে তুলিয়া দেখিলাম, সেটা একখানা কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর—আমরা তিনজনই সেই গৃহের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর পার্শ্বে পতিত। আমরা কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

যাহা হউক, প্রাণটা যে বাজে খরচ হয় নাই, ইহাই ভাল! সম্ভবতঃ আশ্রয়ও মিলিবে। এ গৃহে যেই থাকুক না কেন, এ অবস্থায় আশ্রয় দিতে কখনও অসম্মত হইবে না। আমরা আলো ধরিয়া ধরিয়া গৃহের দ্বারে আসিলাম। দরজা বন্ধ।

আমি দরজায় করাঘাত করিলাম—কেহ উত্তর দিল না, এবার আমি আরও বেশি রকম শব্দ করিয়া সবলে করাঘাত করিলাম, তবুও কেহ উত্তর দিল না; তখন আমি দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিলাম, কড় কড় শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে বাহির হইতেও অন্ধকার।

আমি আলো লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম—প্রবোধ ও খদ্দিমেনা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল, কিন্তু তৎপরে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিল। খদ্দিমেনা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, তৎপরে ছুটিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আমরা উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্ধকার হইতে কেবল একটা ভীতিব্যঞ্জক আর্ত্তরব আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, আমরা কেবলমাত্র সেই শব্দের এইমাত্র বুঝিলাম;—

"সয়তান কা ঔরত।"

প্রবোধ বলিল, "বোধ হয়, এখানকার লোকের বিশ্বাস, এই বাড়ীতে ভূত আছে—পাহাড়ীমাত্রেই ভূত বড় বিশ্বাস করে। যাহাই হউক, খাদে পড়িয়া যে আজ প্রাণটা যায় নাই, এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। শীতে বুক গুর্ গুর্ করিতেছে, এ আশ্রয়ও ভগবান্ মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কাঠকুটা সংগ্রহ

করিয়া আগুন জ্বালা যাক। আলো দেখিলে কুলি দুটো আর গুণবন্ত থম্বিসেনা প্রাণের দায়ে এখানে আবার ফিরিয়া আসিতে পথ পাইবে না।

আমরা বাহিরে আলো লইয়া কতকগুলা শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিলাম, তৎপরে তাহা জ্বালাইয়া গৃহমধ্যে আগুন করিলাম। আগুনে হাত সেঁকিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমাদের ব্যাগে সর্ব্বদাই আমরা কিছু-না-কিছু আহার্য্য রাখিতাম। প্রবোধ তাহাই বাহির করিতে প্রবলবেগে ভোজন আরম্ভ করিল, আমি বলিলাম, "আগে ঘরটা ভাল করিয়া দেখা যাক্।"

প্রবোধ বলিল, "আগে প্রাণে বাঁচ্‌লে ত আর সব, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এই পাহাড়ে শীতে আর এই পাহাড়ে রাস্তায় যেন ক্ষুধা হাজার গুণ বাড়িয়া উঠে।" অগত্যা আমরা উভয়ে সেই আগুনের পাশে বসিয়া কিছু আহার করিয়া লইলাম।

আহার শেষ হইলে উভয়ে বাতী লইয়া ঘরটি ভাল করিয়া দেখিতে চলিলাম, একটি ঘর নহে, পাশাপাশি দুইটি ঘর। গৃহমধ্যে নানাবিধ তৈজসপত্র পড়িয়া আছে; দেখিলেই বোধ হয়, শেষে যাহারা এই বাড়ীতে ছিল, তাহারা যে কারণেই হউক, হঠাৎ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেক জিনিষপত্র পড়িয়া আছে, লইয়া যাইবার সময় হয় নাই—তাড়াতাড়ি যে চলিয়া গিয়াছে, এই ঘরের অবস্থা দেখিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

একটা বাক্সও ঘরের কোণে পড়িয়া আছে—দেখিলাম, খোলা—ডালা তুলিয়া দেখি, তাহার ভিতর অনেকগুলি নানা তারিখের বাংলা চিঠী রহিয়াছে।

এই দুর্গম স্থানে এই নির্জ্জন বাড়ীতে তাহা হইলে পূর্ব্বে কোন বাঙালী বাস করিয়াছিল; কে সে? এত স্থান হইতে এখানে আসিয়াছিল কেন? দারুণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বাতীটি সেই বাক্সের উপর রাখিয়া পত্রগুলি একে একে পাঠ করিতে লাগিলাম। যখন সর্ব্বশেষ পত্রখানির পাঠ শেষ হইল, তখন নিম্ন হইতে সেই অন্ধকার আলোড়িত করিয়া এক হৃদয়বিদারক উচ্চ আর্ত্তনাদ উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই এই ভয়াবহ শব্দ আমাদের কানে আসিতে লাগিল। ইহা আমাদের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা বা কোন মনুষ্যের আর্ত্ত-নাদ, তাহা কেবল ভগবান্ বলিতে পারেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সমস্ত রাত্রি সেই গৃহমধ্যে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম, ভয়ে চক্ষু মুদিত করিতে সাহস করিলাম না।

যে সকল পত্র আমরা পাঠ করিলাম, তাহার প্রথমখানি এই;—

প্রথম পত্র।

"প্রিয় সুরেশ,

কলিকাতার সেই গোলযোগ অশান্তির মধ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া এই নির্জ্জন পাহাড়মধ্যে এই স্থানে আমি যে কি শান্তি অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আর লোকালয়ে থাকিব না, লোকালয়ে থাকিলে আর আরাম হইতে পারিব না, এইজন্য এই দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইয়াছি। আমার মস্তিষ্ক যেরূপ উষ্ণ হইয়াছিল—তাহা আর নাই, আমি এখন শান্তচিত্তে চিন্তা করিতে পারিতেছি। আর এই স্থানের ন্যায় চিন্তা করি-বার স্থান দ্বিতীয় আর কোথায়?

আমার এই বাড়ী পর্ব্বতের মাঝামাঝি স্থাপিত, পশ্চাতে স্তরে স্তরে পর্ব্বতশ্রেণী আকাশভেদ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, সম্মুখে একটু আগে একেবারে মহা খাদ, দুই সহস্র হাত নিম্নে একটি নদী রজতসূত্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এ বাড়ীখানিতে দুইটিমাত্র ঘর। ঘর বলিতে চাও, আর যাহা বলিতে চাও, তাহাই ইহাকে বলা যায়; কতকগুলি শালকাঠ জোড়া দিয়া প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে—চালও ঐ শালকাঠে জোড়া, এখানে শালকাঠের অভাব নাই, চারিদিকেই শালকাঠ—কাটিয়া লইলেই হইল। আমার সঙ্গে চাকর-বাকর নাই, চেষ্টা করিয়াও পাই নাই প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটা ভুটিয়া বস্তি আছে, সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট হয়, হাটের দিন সকালে রওনা হইয়া আমার দরকার মত দ্রব্যাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরি।

সময় কাটাইবার জন্য একখানা খুব বড় উপন্যাস লিখিতেছি, বোধ হয়, তাহাতেই আমি জগদ্বিখ্যাত হইব।

আমি একজন লোক পাইয়াছি। রাত্রে সে কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকিতে চাহে না, তা না থাকুক, ক্ষতি নাই। দিনেই সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সারিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং আমার স্ত্রীকে আর পূর্ব্বের ন্যায় খাটিতে হইতেছে না।

এই নির্জ্জন দুর্গমস্থানে থাকিতে সে সম্পূর্ণ নারাজ হইয়াছিল, আমিই বুঝাইয়া রাখিয়াছি, লোকালয়ে থাকিলে আমার রোগ আরাম হইবার আশা নাই, এই কথা বলায় সে সম্মত হইয়াছে।

রাত্রে সে পার্শ্বের ঘরে নিদ্রা যায়—আমি সম্মুখের ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই প্রকাণ্ড উপন্যাসখানা লিখি।

তোমার মন্মথ।"

দ্বিতীয় পত্র।

(দ্বিতীয় পত্রে কেবল সেই উপন্যাসের কথা এবং সেই উপন্যাসের প্রশংসার ভাগই অধিক।)

তৃতীয় পত্র।

"প্রিয় সুরেশ!

'তোমাকে দুইখানা পত্র লিখিয়াছি, এইখানা লইয়া তিনখানা হইবে, কিন্তু কোনখানাই এখনও ডাকে দিতে পারি নাই। ডাকঘর প্রায় দশ ক্রোশ দূরে, পত্র তিনখানা ডাকে দিবার জন্য এখনও কোন লোক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহার একটা গুরুতর কারণ আছে। সহজে এ বাড়ীর নিকট কেহ আসিতে চাহে না, অধিক পয়সা দিতে চাহিলেও না। আগে ইহার কারণ জানিতে পারি নাই, একদিন এক বৃদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বৃদ্ধ আমাকে এ রহস্যের বর্ণনা করিল ব্যাপার এই;—

সোহো বলিয়া একটা লোক এই কুটীর নির্ম্মাণ করে। সে ভুটিয়াদিগের মধ্যে একজন কবি বলিয়া গণ্য ছিল। সে নির্জ্জনে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াই এই দুর্গমস্থানে এই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এখানে নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বাস করিত।

সুখেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকটস্থ এক ব্যক্তির একটি ভুটিয়া যুবতী সেই নিভৃতনিবাসী

কবির প্রেমে পড়িল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই কুটীরে দুইটী ঘর, যখন গভীর রাত্রে পার্শ্বের গৃহে সোহোর যুবতী স্ত্রী নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে এই যুবতী তাহার পার্শ্বে বসিয়া মৃদুমন্দ-কণ্ঠে প্রেমালাপ করিত।

একদিন রাত্রে তাহার স্ত্রী সকলই জানিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

এই যুবতীকে এই কুটীরে আসিতে হইলে একটা কাঠের সাঁকো পার হইয়া আসিতে হইত। এই সাঁকো প্রায় পাঁচশত হাত নিম্নে এক ঝরণা বা ঝোরা, প্রবলবেগে সেই ঝরণা দিয়া জল পড়িত বলিয়া ভুটিয়ারা ইহার নাম "পাগলা ঝোরা" রাখিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে এই ঝরণার উপরের সাঁকো দিয়া সেই যুবতী যাতায়াত করিত।

একদিন সোহো গৃহে না থাকায় তাহার স্ত্রী সুবিধা পাইয়া সেই সাঁকোর কাঠ একদিক্ টাঙ্গি দিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল। এমন সামান্যমাত্র সাঁকোর কাঠ পাহাড়ে সংলগ্ন রহিল যে, মনুষ্যভার পড়িলেই তাহা নিশ্চিত পতিত হইবে।

তাহাই ঘটিল। সে রাত্রে পূর্ব্বের ন্যায় সোহো প্রণয়িনীর প্রতীক্ষা করিতেছে, সহসা তাহার কর্ণে এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল, তাহার পরই প্রকাণ্ড কাঠ ও পাথরের পতনের শব্দ আসিল, তাহার প্রণয়িনী পাঁচ শত হস্ত নিম্নে পাগলা ঝোরায় বিসর্জ্জিত হইয়াছে।

কে এ কাজ করিয়াছে, তাহা সোহোর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইহার ফলে একদিন সোহো ও তাহার স্ত্রী উভয়েই গভীর খাদে পতিত হইল।

সোহো তাহার স্ত্রীর গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু ভুটিয়া স্ত্রীলোকদিগের দেহে অসীম বল, সোহোর স্ত্রী তাহাকে টানিতে টানিতে খাদের নিকট লইয়া আইসে, তথাপি সোহো তাহার গলা হইতে হাত অপসারিত করিল না, তাহার স্ত্রীর চক্ষু কপালে উঠিল, তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, তবুও সে তাহার স্বামীকে ছাড়িল না, উভয়ে দুই সহস্র হাত নিম্নে গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল।

এতদূর বলিয়া বৃদ্ধ ভুটিয়া বলিল, 'সেই পর্য্যন্ত সোহোর প্রণয়িনী সোহোর বাড়ীতে প্রেত হইয়া আইসে। ভিতরে আলো দেখিলে সে দরজায় আঘাত করে। তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেয়, এমন সাধ্য কাহারই নাই। অনেকে এই বাড়ীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু এ বাড়ীতে যে বাস করে, তাহারই মৃত্যু হয়।'

এইজন্যই এই সোহো প্রণয়িনীর ভূতের জন্য কেহ সাহস করিয়া এখানে আসে না। আমার দ্রব্যাদি হাট হইতে আমাকেই নিজে আনিতে হ, এইজন্যই এ পর্য্যন্ত পত্র ডাকে পাঠাইতে পারি নাই।

তোমার মন্মথ।"

চতুর্থ পত্র।

"প্রিয় সুরেশ,

দেশে হইলে এ কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম ; বোধ হয়, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই একথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম ; কিন্তু এই নির্জ্জন দুর্গমস্থানে ভূতের কথা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

রাত্রে—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া আমার সেই বিরাট উপন্যাসখানা আমি প্রত্যহ লিখিয়া থাকি, কিন্তু বৃদ্ধ ভুটিয়ার নিকট এই কথা শোনা পর্য্যন্ত রাত্রে আমার লেখা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি শুনিলে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, কিন্তু সত্য গোপন করাও ঠিক নহে, প্রকৃতই সেইদিন হইতে রাত্রে লিখিতে লিখিতে মধ্যে মধ্যে লেখা বন্ধ করিয়া আমি কান পাতিয়া শুনিতাম, দরজায় কেহ ঘা মারিতেছে কিনা। যথার্থই কি আমার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। ইহারই মধ্যে যেন সোহো প্রণয়িনী আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে—হাসিও না, এই নির্জ্জন দুর্গম লোকশূন্য স্থানে সকলই সম্ভব! তোমার সেখানে যাহা হাস্যজনক, এখানে তাহা ভীতিপ্রদ!

কাল যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমারও যে বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, মাথা খারাপ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমারই নিজের বিশ্বাস হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে আমি কুটীরের বাহিরে বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভগ্ন সাঁকোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম; উঁকি মারিয়া সাঁকোটার নিম্নস্থ পাগলা ঝোরা দেখিতেছিলাম, সহসা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, দূরে সুন্দর বনফুলে সজ্জিত একটি পাহাড়িয়া যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তখন চারিদিক্ ধীরে ধীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে-ছিল, এখানে এ কুটীরের এত নিকটে এ পর্য্যন্ত আমি কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ—জনপ্রাণী দেখিতে পাই নাই। এখান হইতে লোকালয় দুই ক্রোশের নিকটে নহে, রাত্রে এই দুর্গম পথ দিয়া কাহারও গমন করা সম্ভব নহে।

তবে এ তরুণী কে? এ এখনও এখানে কেন? আমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কণ্ঠ পরিষ্কারের অব্যক্ত শব্দ করি-লাম, তথাপি সে নড়িল না, আমি ডাকিলাম, তবুও সে নড়িল না, এই দুর্গম পর্ব্বতে আমার গলার শব্দ তাহার নিকট পৌঁছি-তেছে না ভাবিয়া, আমি তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিলাম; তখন সে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল—আমি গৃহের দিকে ফিরিলাম, আমার শিরায় শিরায় যেন কে বরফের প্রবাহ ছাড়িয়া দিল, কেন আমার এ ভাব হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তবে কি এ মানুষ নহে—এই কি সেই মোহ-প্রণয়িনী?

তোমার মন্মথ।"

পঞ্চম পত্র।

(পূর্ব্বোক্ত পত্রের এগার দিন পরে লিখিত)

"প্রিয় সুরেশ,

যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই ঘটিয়াছে। সে আসিয়াছে—আমি যেদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে পর্ব্বতমধ্যে দেখিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সে নিশ্চয়ই একদিন আসিবে।

কাল রাত্রে সে আসিয়াছে। আমরা উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ বসিয়াছিলাম।

তুমি নিশ্চয়ই বলিবে, আমি উন্মত্ত হইয়াছি—আমার রোগ সারে নাই, এখনও সেই জর আছে, তাই সেই জরের প্রকোপে বিকৃতমস্তিষ্কে কল্পনায় আমি এই প্রেতাত্মা দেখিতেছি।

তুমি বলিবে কেন, আমি নিজেকেই নিজে এ কথা অনেকবার বলিয়াছি, এ সকল সত্য ও সে আসিয়াছে। কি সে? রক্ত-মাংসের দেহধারিণী নারীমূর্ত্তি অথবা আকাশের প্রাণী—বায়ু মূর্ত্তি—আমার কল্পনার সৃষ্টি! যাহাই হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে-যায় না। আমার নিকট ইহা কল্পনা নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে, মিথ্যা নহে। সত্য—অতি সত্য!

গত রাত্রে সে আসিয়াছিল। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে নিদ্রিতা, আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সম্মুখের ঘরে বসিয়া সেই উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম, এই সময়ে সে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রত্যহ রাত্রে আমি ইহার প্রতীক্ষা করিয়াছি—দ্বারে তাহার মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে অপেক্ষা করিয়াছি, ইহার আসার আশায় প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইয়াছি। এখন আমি আমার মনের এ অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আমি সাঁকোর উপর ইহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছি, তিনবার দরজায় আঘাত সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি—তিনবার মাত্র।

ইহাতে আমার কঙ্কালের ভিতর যেন তীক্ষ্ণ তুষার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মস্তিষ্কে একরূপ অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমি সবলে আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছি, তবুও সেই শব্দ, সেই দ্বারে আঘাত, তিনবার—তিনবার মাত্র। আমি উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিয়াছি।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, ধীরে ধীরে গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম—দ্বারে শিকল টানিয়া দিলাম। তৎপরে উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আবার সেই শব্দ—সেই দ্বারে আঘাত, তিনবার—তিনবার মাত্র।

তখন আমি গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিলাম—অতি শীতল বায়ু প্রবলবেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার কাগজ-পত্র কতক উল্টাইয়া, কতক গৃহতলে ছড়াইয়া দিল, রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, আমি নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া করিয়া দিলাম।

সে তাহার মস্তক হইতে শাল সরাইয়া স্কন্ধে ফেলিল, কণ্ঠদেশ হইতে একখানা রঙ্গিন রুমাল খুলিয়া পার্শ্বে রাখিল, তাহার পর আমার সম্মুখে আগুনের কাছে আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম, তাহার উন্মুক্ত পা দুখানি তখনও শিশিরসিক্ত রহিয়াছে।

আমি তাহার সম্মুখে বসিলাম, বিস্ফারিতনয়নে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিল—সে হাসি মধুর, অথচ বিস্ময়কর, যেন ধূর্ত্ততা শঠতা তাহাতে মাখা। সেই হাসিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি তাহাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত—সর্ব্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত।

সে কথা কঁহিল না, নড়িলও না, আমিও তাহার কথা শুনিবার কোন আবশ্যকতা মনে করিলাম না, সেই বিলোল চোখ, সেই চপল দৃষ্টি, তাহাই যেন আমার সহিত কত প্রাণের কথা কহিতে লাগিল। সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহার দিকে চাহিয়া আছি—তাহার চক্ষু আমার চক্ষুর সহিত—আমার চক্ষু তাহার চক্ষুর সহিত পরস্পর সম্মিলিত—সে আনন্দ, সে সুখ—সে যে কি, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই!

আমি কতক্ষণ এইরূপ ভাবে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না, সহসা সে নিজের বুকের কাছে একটা হাত তুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল, তখনই পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একটা অতি মৃদু শব্দ কানে আসিল। অমনি সেই অপরিচিতা রামা সত্বর তাহার সেই শালখানা তাহার মাথায় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে অতি দ্রুতপদে দরজা খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

আমি ভিতরের ঘরের শিকল খুলিয়া কান পাতিয়া শুনিলাম, কোন শব্দ নাই। তখন আমি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম, তাহার পর বোধ হয়, সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র আমার মনে হইল যে, রমণী রাত্রে রুমাল-খানি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার চলিয়া যাইবার পরও আমি তথায় রুমালখানি দেখিয়া-ছিলাম, তাহাই ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র সেখানা লুকাইয়া রাখিব বলিয়া সেইদিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রুমাল তথায় নাই—আমার স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিয়া সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াছে, আমার চাএর জন্য জল গরম করিতেছে। সে আমার দিকে দুই-এক-বার চাহিল—আমি তাহাকে এমন করিয়া চাহিতে আর কখনও দেখি নাই ; কিন্তু সে কোন কথা কহিল না—রুমালের কথাও কিছু বলিল না।

তাহাতেই আমার মনে হইল যে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি মাত্র, কাল রাত্রে যাহা সত্য ভাবিয়াছিলাম, তাহা আর কিছু নহে, স্বপ্নমাত্র ; কিন্তু অপরাহ্নে আমি একবার বাহির হইতে দেখিলাম, আমার স্ত্রী সেই রুমালখানি হাতে লইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতেছে। তাহার মুখ অপরদিকে ছিল, সুতরাং সে আমাকে দেখিতে পাইল না—আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রুমালখানা দেখিতেছে।

আমি কতবার মনে করিলাম যে, রুমালখানা আমার স্ত্রীরই। কাল রাত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই আমার কল্পনা—স্বপ্নমাত্র। আর তাহা যদি না হয়, তবে কাল রাত্রে যে আসিয়াছিল, সে প্রেতাত্মা নহে—প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক।

কিন্তু মানুষ মানুষে চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে, কাল রাত্রে যে আমার সম্মুখে বসিয়াছিল, সে রক্তমাংসের কোন জীব নহে—ইহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

সে কোন স্ত্রীলোক সম্ভবতঃ হইতে পারে। এখান হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে কোন বস্তি বা লোকালয় নাই। দিনেই এই পার্ব্বত্য পথে চলা-ফেরা বিপজ্জনক—রাত্রে অসম্ভব। কোন্ স্ত্রীলোক অন্ধকার রাত্রে এই ভয়াবহ কঠিন পর্ব্বত পথে আসিতে সাহস করিবে? তাহাতে ঘোর অন্ধকার, দারুণ শীত—কোন স্ত্রীলোকের এই দুর্গম স্থানে, এ কুটীরে আগমন একেবারেই অসম্ভব।

আরও কারণ—কোন্ স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে শিরায় শিরায় অস্থিমজ্জায় গলিত তুষার স্রোতঃ প্রবাহিত হয়?

যাহাই হউক, সে যে-ই হউক, সে যদি এবার আসে, তাহা হইলে তাহার সহিত কথা কহিব। আমি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিব, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব, সে রক্তমাংসের জীব না বায়ু—কেবল কল্পনা, কেবল শূন্য, একটা ছায়ামাত্র।

তোমার মন্মথ।"

ষষ্ঠ পত্র।

"প্রিয় সুরেশ,

এই সকল পত্র কখনও যে তুমি পাইবে, সে আশা আমার নাই। আমি এখান হইতে এ সকল চিঠী তোমাকে পাঠাইব না। তোমার নিকট এ সকল পাগলের পাগলামী, উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। যদি কখনও দেশে

ফিরি, তাহা হইলে হয় ত কোনদিন-না-কোনদিন এই সকল পত্র তোমায় দেখাইতে পারি, তাহাও শীঘ্র নহে। যখন আমরা এইসব লইয়া হাস্য বিদ্রূপ করিতে পারিব, কেবল সেই সময়েই তোমায় এ সকল পত্র দেখাইব। এখন আমি এগুলি লিখিতেছি, আমার মনের যাতনায়, এগুলি এইরূপে না লিখিলে হয় ত আমাকে চীৎকার করিয়া মনের যাতনা লাঘব করিতে হইত।

সে প্রত্যহ রাত্রে আসে, সেই রকম আগুনের কাছে বসে, সেই রকম আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি বিন্যাস করে—সেই কুহকিনী মৃদুমধুর হাসি হাসে—আমার মস্তিষ্ক ঘোরতররূপে বিচঞ্চল হইয়া উঠে, আমি আত্মহারা হইব—আমার অস্তিত্ব যেন তাহার মধ্যে লীন হইয়া যায়।

এখন আমার লেখা সম্পূর্ণই বন্ধ হইয়া গিয়াছে—লিখিবার চেষ্টাও করি না। আমি সাঁকোর উপর তাহার শুভাগমনের পদশব্দ—ঘাসের উপর পদশব্দ—দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া থাকি।

সে আসিলে সেই ভাব—আমি আর কথা কহিতে পারি না—আমি আর আমাতে আমি থাকি না—কোন কথাই আর মনে হয় না—সে-ও কোন কথা কহে না, কেবল সেইরূপ ভাবে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ হাসি হাসে।

প্রত্যহ আমি মনে করি, আজ সে আসিলে আমি নিশ্চয়ই তাহার সহিত কথা কহিব, নিশ্চয়ই তাহাকে স্পর্শ করিব; কিন্তু সে আসিবামাত্র আমি সকলই ভুলিয়া যাই, আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কাল রাত্রে যখন আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমার মন তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত হইল, সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের গবাক্ষের দিকে চাহিলাম, চাহিবামাত্র বোধ হইল, কে জানালা হইতে সহসা মুখ সরাইয়া লইল। এদিকে নিমেষ মধ্যে সে শাল মস্তকে টানিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি আলো লইয়া পার্শ্বের গৃহে গেলাম; দেখিলাম, আমার স্ত্রী নিদ্রিতা রহিয়াছে।

তোমার মন্মথ।"

সপ্তম পত্র।

"প্রিয় সুরেশ,

রাত্রির জন্য আমি ভীত নহি, দিনের জন্যই ভীত। যে স্ত্রীলোককে আমি আমার স্ত্রী বলিয়া আসিতেছি, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত এখন ঘৃণা করি, সে ঘৃণার ইয়ত্তা নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই। তাহার যত্ন শ্রদ্ধা সোহাগ সমস্তই এখন বিষবৎ বোধ হয়। কি জানি, কেন তাহার চোখের দিকে চাহিলে আমি শিহরিয়া উঠি।

সে সকলই দেখিয়াছে, সকলই জানিতে পারিয়াছে, আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি—তাহাই কি?

অথচ সে আমাকে এখনও ভালবাসে, যত্ন পূর্ব্ববৎ, অনুরাগ পূর্ব্ববৎ—ভক্তি পূর্ব্ববৎ। তথাপি আমার মনে হইতেছে, সমস্ত জাল, সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই ছলনা, সমস্ত প্রতারণা—আমরা পরস্পরে প্রণয় ভালবাসা জানাইতেছি—অথচ সব জাল, সব মিথ্যা, সব ছলনা। আমি জানি, সে সব দেখিয়াছে, সব জানিয়াছে, তাহার চোখ আমাকে ইহা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে। আমি জানি, সে কেন এই ভীষণ প্রতিহিংসার আয়োজন করিতেছে।

তোমার মন্মথ।”

অষ্টম পত্র।

“প্রিয় সুরেশ,

আজ সকালে হাটে যাইব বলিয়া আমি বাহির হইলাম। আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল, ক্রমে আমি তাহার দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। পরে একবার চাহিয়া দেখি, দূর হইতে আমার স্ত্রীকে একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় দেখাইতেছে; অবশেষে পর্ব্বত বেষ্টন করায় আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন আমি উঠিতে পড়িতে পড়িতে মহাবেগে ছুটিয়া অন্য পথ দিয়া গৃহের দিকে আসিতে লাগিলাম। পার্ব্বত্যপথ সহজ নহে, কত উঠিয়া পড়িয়া তবে অন্যদিক্ দিয়া আমার গৃহের নিকট আসিলাম। তথায় এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার গৃহপ্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, আমার স্ত্রী এক টাঙ্গি লইয়া কাঠের সাঁকোর নিকট আসিল। আমি যেখানে ছিলাম, তথা হইতে, সে কি করিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই দূর হইতেও আমি তাহার মুখে হাসি লক্ষ্য করিলাম—কিন্তু মনে হইল, সে হাসির ভিতরে প্রতিহিংসার বহ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতেছে।

সে গৃহে চলিয়া গেলে আমি আবার হাটের দিকে চলিলাম। হাট হইতে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম, সে আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদরে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

আমি যে তাহার ভয়াবহ কার্য্য দেখিয়াছি, তাহা ঘুণাক্ষরে তাহাকে জানিতে দিলাম না। তাহার সয়তানী কার্য্য ঐরূপই থাক। সে ভাবিয়াছে, কোন স্ত্রীলোক রাত্রে সাঁকো পার হইয়া আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে আসে, তাহাই সে সাঁকো কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছে, আজ সে আসিলে অতল খাদ-নিম্নে পতিত হইয়া যাইবে।

আমি কিছু বলিলাম না। ইহাতে আজ সপ্রমাণ হইবে যে, প্রত্যহ রাত্রে আমার কাছে যে আসে—সে কে। যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে ভগ্নপ্রায় সেতুতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, আর যদি সে প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে——

আমি এ চিন্তা প্রাণ হইতে দূর করিলাম। ভাবিতেও আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

যদি প্রকৃতই মানবী হয়, তাহা হইলে কথা না কহিয়া কেবলই আমার দিকে চাহিয়া থাকে কেন? আমিই বা কেন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। কেন তাহার

সম্মুখে আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। নিশ্চয়ই মানবী নহে, আমার স্ত্রী তাহাব কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না। হতভাগিনী প্রতিহিংসার এই ব্যর্থ চেষ্টায় আরও জ্বলিয়া অস্থির হইবে—বেশ হইবে!

কিন্তু যদি সে প্রেতলোকবাসিনীই হইবে, তবে আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই কেন? কেনই বা তাহার পায়ে স্পষ্ট শিশিরের দাগ দেখিতে পাই—কেনই বা তাহার দ্বারে আঘাত শব্দ শুনিতে পাই? এ সকল ত প্রেতের চিহ্ন নহে।

রাত্রি হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় পার্শ্বের ঘরে আমার স্ত্রী ঘুমাইতেছে। আমি পূর্ব্বের ন্যায় একান্তমনে গৃহে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদশব্দেব প্রতীক্ষা করিতেছি।

যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে সে পূর্ব্বের ন্যায় আমার কাছে আসিবে, আর যদি সে যথার্থই কোন স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাঁকো হইতে পড়িবার সময়ে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইব। অথবা কোন্ প্রেতলোকের অজানিত কুহকজালে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে! সহসা একি—একি এ প্রেতাত্মার বিদ্রূপ!

আমি শুনিয়াছি—আমি সেই ভয়াবহ আর্ত্তনাদ এইমাত্র শুনিয়াছি, হৃদয়ভেদী—গগনভেদী আর্ত্তনাদ আমি শুনিয়াছি। আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া, অন্ধকার রাশি আলোড়িত করিয়া সেই ভয়ানক আর্ত্তনাদ সাঁকোর নিকট হইতে উত্থিত হইল, সেই গভীর খাদমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সে আর্ত্তনাদের বর্ণনা নাই—সে আর্ত্তনাদ এখনও আমার কর্ণপথ দিয়া আমার শিরায় শিরায় শোণিতের সহিত ছুটিতেছে!

আমি গৃহ হইতে সবেগে বাহির হইলাম, সাঁকোর নিকটে আসিলাম, শুইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, সাঁকো আর নাই।

নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঘোর অন্ধকার—সেই গভীর গহ্বর ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ—কিছু দেখিবার উপায় নাই!

প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। সেই প্রবল বাতাসে আমার উচ্চ প্রবল চীৎকার যেন পৈশাচিক হাস্যকল্লোলের ন্যায় দিগ্বলয় কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমি বুঝিতেছি। এতদিন যে উন্মত্ততা ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করিতেছিল, যাহা দূর করিবার জন্য আমি এ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু তাহা আজ আমাকে অত্যন্ত কঠিন ভাবে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে, আর কোন উপায় নাই—চেষ্টা বৃথা—বৃথা—বৃথা——

আমি কতবার মনে মনে বলিতেছি, এ কেবল আমার বিকৃত অসুস্থ পীড়িত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র—এ আর্ত্তনাদও আমার কল্পনা মাত্র—না—না—না—ঐ সেই শব্দ! ঐ সেই আর্ত্তনাদ! ঐ সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ!

প্রতিক্ষণে আমার মস্তিষ্কে কে যেন গুরুভার লোহার হাতুড়ী দিয়া নির্দ্দয় আঘাত করিতেছে। আমি বুঝিয়াছি, সে আর আমার কাছে আসিবে না—এই শেষ!

তোমার মন্মথ।"

শেষ পত্র।

"প্রিয় সুরেশ,

আমি একটা বড় খামে সমস্ত পত্রগুলি রাখিয়া তোমার ঠিকানা লিখিয়া যাব। যদি কখনও কেহ এইখানে আসে, তাহা হইলে সে হয় ত তোমাকে এই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারে।

আমার লেখাপড়া অনেক দিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা—আমি আর আমার স্ত্রী—তোমাকে বুঝাইবার জন্য যাহাকে এখনও আমার স্ত্রী বলিতে হইতেছে, আমরা উভয়ে মুখোমুখী হইয়া বসিয়া থাকি, কেহ কোন কথা কহি না। এ এক অতি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

যখন কথা কহি, তখন এইরূপভাবে কথা কহি, যেন আমাদের উভয়ের এই প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দুই-একটা কথা কহি, তাহাও আমাদের পরস্পর মনের ভাব গোপন করিবার জন্য—আমাদের উভয়ের কেহই আর পূর্ব্বের মত নাই। আমি সর্ব্বদাই তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখিতেছি—সে ইহা গোপন করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু আমি ইহা দেখিতেছি। তাহার চেষ্টা বৃথা!

প্রত্যহ রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয়, যেন সে পূর্ব্বের ন্যায় দ্বারে আঘাত করিতেছে, আমি সত্বর গিয়া দরজা খুলিয়া দিই, কিন্তু কই, কেহ নাই, কেবলই অন্ধকার—সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া গৃহে শব্দে বাহিরের কতকটা শীতল বাতাস প্রবেশ করে মাত্র—আর কিছুই না।

এই দুর্গম নিভৃত স্থানে বাস করিয়া আমি দানব হইয়াছি! ভালবাসা ও ঘৃণা দুই-ই ভয়াবহভাবে আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটাইয়াছে, আমার মস্তকে শত চিতানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। আমার লেখাপড়া, শিক্ষা, সদ্‌গুণ, সমস্ত এই পাহাড়ের বাতাসে যেন আমার হৃদয় হইতে উড়িয়া গিয়াছে! আমি হিংস্র পশু হইয়াছি!

কবে ইহার—এই স্ত্রীলোকের, যে এক সময়ে আমার স্ত্রী ছিল, তাহার কুসুম-কোমল সুন্দর কণ্ঠদেশ আমার এই রোগ-শীর্ণ কঙ্কালসার কঠিন অঙ্গুলি দ্বারা সবলে পেষণ করিব—তাহার চমৎকার চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিবে, তাহার ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত হইবে—তাহার আরক্ত জিহ্বা লতাইয়া পড়িবে, কবে তাহার গলা ধীরে ধীরে, জোরে জোরে, আরও জোরে টিপিতে থাকিব! দেরি নাই—দেরি নাই—দেরি নাই!

তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিতে ঠেলিতে এই কুটীর হইতে লইয়া যাইব—এই বন্ধুর কঠিন পাথরের উপর দিয়া লইয়া যাইব—এই খাদের নিকট আনিব। সে বড় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল বটে—এবার হাসির পালা আমার! হো—হো—হো——

আমি জোর করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া লইয়া যাইব, ধীরে ধীরে আদর করে—এই খাদের ধারে যখন তাহার পায়ের একটিমাত্র অঙ্গুষ্ঠ পাহাড়ে থাকিবে—সে হেলিয়া পড়িবে, তখন আমি তাহার দিকে অবনত হইয়া তাহার আরক্ত অধর চুম্বন করিব—তাহার পর নিম্নে—নিম্নে—নিম্নে—কুয়াসার মধ্য দিয়া, লতাপাদপ গুল্ম ভেদ করিয়া, পশু পক্ষীকে

গুম্ভিত করিয়া—নিম্নে—নিম্নে—গভীরতর নিম্নে—দুই জনে একত্রে যাইব—যাইব—যাইব—যাই—যতক্ষণ না তাহার সহিত মিলিত হই——”

(এই পত্র অসম্পূর্ণ।)

* * * *

এই শেষ পত্র—এই ভয়াবহ পত্র কয়েকখানি পাঠ করিয়া আমি প্রবোধের মুখের দিকে চাহিলাম, সে-ও আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহার মুখে যে ভাব দেখিলাম, সে বোধ হয়, আমার মুখে তাহাই দেখিল। আমি দেখিলাম, প্রবোধের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা উভয়ে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে সাহস করিলাম না। উভয়েরই হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল।

সংসারে এই ভয়াবহ ব্যাপার যে ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমাদের পথপ্রদর্শক থম্বিমেনা “সয়তান কা ঔরত,” বলিয়া যে ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে, এখন বুঝিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে।

এতদিন ভূত-প্রেতের কথা বিশ্বাস হয় নাই। ভূত-প্রেত হউক বা না হউক, পত্রলেখক মন্মথ এই নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ভূতের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল; সেই উন্মত্ততায় হতভাগ্য আপনার স্ত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, নিজেও মরিয়াছে, তাহার প্রমাণ এই সকল পত্র।

* * * *

ভোর হইতে-না-হইতে আমরা সে স্থান হইতে পলাইলাম। রামোচন্দ্র! আর সেখানে এক মিনিট থাকে! বস্তিতে আসিয়া আমাদের দুই কুলি ও খম্বিমেনাকে পাইলাম। আমরা যে সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া এখনও জীবিত আছি, ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * * *

আমরা দার্জ্জিলিং পৌঁছিয়া পত্রগুলি সমস্ত কমিসনার সাহেবকে দিলাম। শুনিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞায় এই ভয়াবহ কুটিরটা একদিন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।

হীরার কন্ঠী

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

চুরি

রাওলপিণ্ডির "জাতীয় ভাণ্ডার" নামক হীরকজহরতের কার-বার সুপ্রসিদ্ধ মারকেটের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ ময়দানের উপরে বিরাজিত ছিল। এবং তাহার প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত সৌধ পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

কারবারের দুইজন প্রাচীন অংশীদার বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কারবার হইতে আপনাদের অংশ তুলিয়া লয়েন নাই। এক-জনের নাম রাম সিংহ, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় নবতি বর্ষ হইবে। তিনি রকুটোবী পাহাড়ের কাছে বাস করেন। দ্বিতীয় অংশী-দারের নাম সুজন সিংহ, বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। বাতে পঙ্গু হইয়া পড়াতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুজন সিংহ পে অফিস লেনে বাস করেন।

কারবারে আরও অনেক অংশীদার আছেন। তন্মধ্যে অজিত সিংহই সকলের অপেক্ষা উদ্যোগী। তাঁহার মিষ্ট ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মোহিত হইয়া অনেক ক্রেতা অপর কোন

স্থান হইতে জিনিষ না কিনিয়া জাতীয় ভাণ্ডার হইতেই ক্রয় করিতেন। অজিত সিংহ দেখিতেও অতি সুপুরুষ। গৌরবর্ণ, বড় বড় চক্ষু চশমাশোভিত, সুগঠিত নাসা, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ গঠন।

কারবারের কার্য্যাধ্যক্ষের নাম বীরেন্দ্র রাও। বীরেন্দ্র রাও এম এ পাশ করা সুশিক্ষিত, ভদ্রবংশীয় যুবক। নির্ম্মল চরিত্রের নিমিত্ত সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করে। আজ তিন বৎসর যাবৎ তিনি প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বিনয়-নম্র ভদ্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়েন। অজিত সিংহ ও বীরেন্দ্র রাও পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ—যেন হরি-হর-আত্মা—কারণ, উভয়েরই বয়স অল্প, কাহারই ত্রিশের বেশী হইবে না।

বীরেন্দ্র একদিন কার্য্যালয়ে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে আপনার কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে অজিত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্র কলমটি আধারে রাখিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, "কিহে অজিত! মুখে আজ হাসি ধরে না যে বড়, ব্যাপারখানা কিহে?"

অজিত একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ মানুষের জীবনে তিনটা প্রধান কাজ। তার ভেতরে জন্মটা যে হইয়া গিয়াছে, সেটা তোর খুব বিশ্বাস করা যোগ্য হয়, এখন বিবাহটা হয় হয় বলিয়া।"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "সত্য নাকি? এমন কোন্ দুর্ভাগ্যবতীর দুরদৃষ্ট হইয়াছে যে, তোমার মত ব্যবসাদার শুষ্কপ্রাণ লোককে প্রেমার্ণবের কর্ণধার পদে বরণ করিবে?"

অজিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "দুর্ভাগ্যবতী! হাঁ অনেকটা তাই বটে। আমরা ভাই কাজের মানুষ, পৌষ মাসের কুয়াশায় চাঁদিনী দেখিতেও পাই না, শীতকালকে বসন্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া কুঞ্জবন খুঁজিয়া বাহির করিতেও পারি না। আর দুই হাতে আলিঙ্গন কি করিব গণ্ডমুখসুধায় সিক্ত করার অবসর ত একদম ঘটিয়াই উঠিবে না—কি বল হে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অজিত উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহার পর কহিলেন, "সুজন সিংহের দৌহিত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। নাম কমলাবতী। ভারি সুন্দরী—কিন্তু বুড়ো সুজন সিংহ আমার কথায় প্রথমে কিছুতে কান দেন নাই। তার কথা শুনিয়া বোধ হয়, যেন তিনি আমাকে সদ্যোজাত দুগ্ধপোষ্য শিশু বলিয়া বিবেচনা করেন। আচ্ছা ভাই, বল দেখি, আমার গোঁফ জোড়া এমন লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, আমার কি এখনও বিবাহ করিতে দেরী করা উচিত?" বলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ঘন ঘন সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "না, না, কথনই নয়। আর দুইদিন বাদে ত তোমার এমন কাল গোঁফ জোড়া একদম্ সাদা হইয়া যাইবে। তখন আর কোন যুবতী তোমার গলায় বরমাল্য দিতে একান্ত নারাজ হইবে।"

"এখন ভাই আসি, হাতে অনেক কাজ রহিয়াছে," বলিয়া অজিত সিংহ প্রস্থান করিলেন। বীরেন্দ্র কিছুক্ষণ অজিতের মানসমোহিনীর সৌন্দর্য্যের অপার্থিবতা কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর আবার লেখনী গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্যে অভিনিবেশ করিলেন।

হঠাৎ একজন কর্ম্মচারী দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বীরেন্দ্রের হস্তে একখণ্ড কাগজ প্রদান করিল। বীরেন্দ্র কাগজখানি পাঠ করিলেন ;—

"বীর !

শীঘ্র উপরে এস। আমাদের সেই হীরার কণ্ঠীটা পাওয়া যাইতেছে না।

অজিত।"

বীরেন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল। এই কণ্ঠীটি জাতীয় ভাণ্ডারের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পত্তি। তিনি দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। দেখিলেন, অজিত আর একজন অংশীদারের সঙ্গে সেই কণ্ঠী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এই ব্যক্তিও যুবক। অল্পদিন হইল, অংশীদার হইয়াছে। স্বভাব তেমন ভাল নহে। নাম অর্জ্জুন সিংহ। বীরেন্দ্রকে দেখিয়া অজিত কহিলেন, "ওহে বীর! ব্যাপারখানা কি বল দেখি! সে কণ্ঠীটা কোথায় গেল হে? এত খুঁজিলাম——"

বীরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিলেন, "যাইবে আর কোথায়? আমি কাল সকালে কণ্ঠীটা দেখিয়াছি। ভাল, আর একবার খুঁজিয়া দেখা যাউক, এখনি বাহির হইয়া পড়িবে।"

সকলে মিলিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও অলঙ্কারখানি পাওয়া গেল না। তাহাতে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল।

অজিত সিংহ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "না, আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করা উচিত নহে। এখনি পুলিসে খবর দিতে হইবে। তার পর আমাদের বৃদ্ধ অংশীদার রাম সিংহকে সকল কথা

জানাইয়া আসিতে হইবে। অর্জ্জুন! তুমি এখন যাইতে পার। তোমাকে আর আমাদের সঙ্গে কষ্ট করিতে হইবে না।"

অর্জ্জুন সিংহ বলিল, "আমিও সঙ্গে থাকি না কেন?"

অজিত বলিলেন, "না, এ সব কাজে বেশী গোলমাল হওয়া ভাল নহে। চল হে বীর! আর হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

অগত্যা অর্জ্জুন সিংহ ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্দেহ

[illegible]রী লিখাইয়া অজিত ও বীরেন্দ্র একখানি গাড়ী-ভাড়া করিয়া বৃদ্ধ অংশীদার রাম সিংহের আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াই রাম সিংহকে দেখিতে পাইলেন।

দুই বন্ধুকে একত্রে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "মাণিক জোড়ের বিকৃতমূর্ত্তে এই দীনের বাড়ী উদয়—বিনা কাজে এ অধম বুড়াকে স্মরণ হয় না—দেখিতেছি, ব্যাপার বড় সাধারণ নহে।"

তার পর সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আমি জানি, তোমরা এমনি একটা কিছু অঘটন ঘটাইবে। বৃদ্ধ কর্ম্মচারীদের বিদায় দিয়া যত অল্পবয়স্ক যুবক কর্ম্মচারী লইয়া এত বড় কারবারটা চালাইতেছ—সুতরাং পরিণামটা আগে হইতেই জানিতাম। থাক্ সে কথা। একটা

পরামর্শ দিতেছি শুন, আজ থেকে একজন পাকা গোয়েন্দাকে রাত্রে কুঠীতে পাহারা দিতে বলিও। এখন তোমরা যাইতে পার," বলিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন। তাহার একটু পরেই অর্জ্জুন সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম সিংহ সংবাদ-পত্র হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "বাঃ! একেবারে ত্র্যহস্পর্শ! অজিত—তিনি মস্ত লোক, তাঁকে জয় করা যায় না; বীরেন্দ্র কিনা বীরের যিনি ইন্দ্র, মহা বীরপুরুষ, আর অর্জ্জুন সেই দ্বাপর যুগের বীর-কেশরী! তা বাপু অর্জ্জুন! শুনিলাম, তুমি নাকি আজকাল গাণ্ডীব ফেলিয়া কণ্ঠী ধারণের অভ্যাস করিতেছ? কোথায় অস্ত্র —আর কোথায় গহনা! এটা ত মোটেই প্রশংসার কথা নয়, কি বল হে?"

অর্জ্জুন সিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলিতেছেন? কলিকালের অর্জ্জুন আমি—অস্ত্র আইনের ভয়ে গাণ্ডীব আমার এ জন্মে নাই। আর গহনার কথা কি বলিতেছেন?"

"তুমি কি কাল রাত্রে জাতীয় ভাণ্ডারে নৈশবায়ু সেবন করিতে গিয়াছিলে?"

অর্জ্জুন সিংহ এইবারে কথাটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "হাঁ, কাল রাত্রে আমি একবার জাতীয় ভাণ্ডারে গিয়াছিলাম বটে। আমার ঘড়ীটা সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম—তাই।"

রাম সিংহ বলিলেন, "তা বেশ বাপু, বেশ। তা আজ এই গরীবখানায় কি মনে করিয়া হে?"

"একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

"কি কথা ?"

"আমার বীরেন্দ্র বাওএর উপরে সন্দেহ হয়।"

"বটে—কেন ?"

"কাল রাত্রে আমি যখন কার্য্যালয় হইতে ঘড়ীটা লইয়া খাড়ী ফিরিতেছিলাম, তখন বীরেন্দ্রকে কার্য্যালয়ের কাছে রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সে আপনার মনে কি ভাবিতেছিল। আমি তার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলাম, কিন্তু আমাকে সে দেখিতে পাইল না—এত অন্যমনস্ক ছিল।"

"এইমাত্র—আর কিছু না ?"

"আব কি ?"

"এখন বসিবে, না আসিবে ?"

"না আসি—হাতে একটা কাজ আছে," বলিয়া অর্জ্জুন সিংহ প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধের বচন

উক্ত ঘটনার পরে ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি সেই হীরার কণ্ঠীর কোন সন্ধান হইল না। এই ছয়মাসকাল একজন ডিটেক্‌টিভ প্রতি রাত্রে জাতীয় ভাণ্ডারে সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়াছিল, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই পুলিস হতাশ হইয়া সমস্ত অনুসন্ধান এককালে ছাড়িয়া দিয়াছে।

যেদিন পুলিস জাতীয় ভাণ্ডারের কার্য্যভার ত্যাগ করিল, সেইদিন বীরেন্দ্র রাও রাম সিংহের নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইল। পত্রে লেখা ছিল, "বীরেন্দ রাও। অত্র পত্র প্রাপ্তি মাত্র আমার সঙ্গে দেখা করিবে। বিশেষ কাজ আছে।"

বীরেন্দ্র বিলম্ব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ রাম সিংহের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরেন্দ্রকে দেখিয়া রাম সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে! নূতন কোন সংবাদ আছে?"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "বড় কিছু নাই। তবে অর্জ্জুন সিংহ হঠাৎ তার অংশ বিক্রী করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে।"

রাম সিংহ সহাস্যে বলিলেন, "অর্জ্জুন আর কোথায় যাইবে, বোধ হয়, অজ্ঞাতবাসে গিয়াছে। কিন্তু সে তোমার উপরে সন্দেহ করে। সে বলে চুরির রাতে তোমাকে জাতীয় ভাণ্ডারের সম্মুখে রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে।"

বীরেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমাকে! হাঁ, আমার পকেট হইতে একখানা কুড়ি টাকার নোট পথে পড়িয়া গিয়াছিল। সেখানা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খুঁজিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পাই নাই।"

রাম সিংহ কহিলেন, "যাক্ সে কথা, এখন যে জন্য তোমাকে ডাকিয়াছিলাম, তা শোন। এই চিঠিখানি লইয়া তুমি সুজন সিংহের কাছে যাও।"

বীরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রাম সিংহ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই 'কেন'র উত্তর পরে দিব, বাপু। এখন মন দিয়া শোন, চিঠিখানি আর কারো হাতে দিও না।"

"যে আজ্ঞা।"

"তার পর সুজন সিংহ তোমাকে এক গোছা চাবী দিবেন।"

"চাবী?"

"হাঁ গো হাঁ, চাবী। সেই গোছার ভিতরের সকলের চেয়ে বড় চাবীটি দিয়া তুমি জাতীয় ভাণ্ডারের কার্য্যালয়ের পাশের দরজা খুলিবে।"

"কেন?"

"আবার 'কেন' তুমি আমাকে জ্বালাইলে, বাপু। যা বলি তা শোন। দরজা খুলিয়া প্রতি রাত্রে তুমি পাহারা দিবে। মনে রাখিবে, এরূপভাবে তোমাকে হয় ত একমাসকাল কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, পারিবে ত?"

"কিন্তু——"

"আঃ, 'কেন'র কথা শেষ হইল ত, এবারে 'কিন্তু'র কথা আসিতেছে। কিন্তু-টিন্তু শুনিতে চাই না, না পার ত বল, আমিই পাহারা দিব।"

বীরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তৎপরে কহিলেন, "আপনি বলেন ত আমি এক বৎসর——"

বাধা দিয়া রাম সিংহ কহিলেন, "তোমার ভবিষ্যৎ সহধর্ম্মিণীর উপরে এক বৎসরকাল পাহারা দিও। তোমাদের যুবকদের সকল কাজেই বাড়াবাড়ি আগে একমাসই পাহারা দাও।"

"আচ্ছা, আপনার কথামতই কাজ করিব।" বলিয়া বীরেন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রাম সিংহ কহিলেন, "দাঁড়াও, আর একটা কথা, রাত্রিকালে কার্য্যালয়ে যদি আশ্চর্য্য কিছু দেখ, তাহা হইলে চীৎকার করিয়া সমস্ত মাটি করিয়া দিও না।"

বীরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আশ্চর্য্য আবার কি দেখিব?"

বিরক্ত হইয়া রাম সিংহ কহিলেন, "বড় বড় ভূত প্রেত দেখিবে। যাহা বলিলাম, তাহার উপরে আর কথা কহিও না।"

"যে আজ্ঞা," বলিয়া বীরেন্দ্র রাও প্রস্থান করিলেন।

রাম সিংহ একটা চুরুট ধরাইলেন। তৎপরে আপনার মনে বলিলেন, "পুলিসের পাহারা উঠিয়াছে—এইবারেই চোরের আসিবার কথা। আমার কার্য্যভার গ্রহণের এই উপযুক্ত সময়। দেখি, চোর মহাশয় এই বৃদ্ধের স্তিমিতদৃষ্টি এড়াইয়া কোথায় যান্। বীরেন্দ্র যদি নির্ব্বোধ না হয়, কোন রকম বোকামী যদি না করে, ঠিক আমার কথামতই কাজ করে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহেই আমাদের জালে মাছ পড়িবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কমলাবতী

সুজন সিংহের বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বীরেন্দ্র তাঁহার আগমনবার্ত্তা ভিতরে প্রেরণ করিলেন। একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে সমাদরে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল।

অল্পক্ষণ পরে একজন রূপবতী যুবতী বীরেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বীরেন্দ্রের নয়ন পরিতৃপ্ত হইল। বুঝিলেন, এই কমলাবতী অজিতের ভাবী সহধর্ম্মিণী, সুজন সিংহের বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

কমলাবতীর এত রূপ! যেন দেবীপ্রতিমা! বীরেন্দ্র ভদ্রতা, স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইলেন। বিস্মৃত হইয়া কমলাবতীর অপরূপ রূপলাবণ্যসুধা পান করিতে লাগিলেন। তেমন রূপ—মর্ত্তে তাহা

অতুলনীয়, বিশ্বে তাহা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কবির তাহা কাম্য, চিত্রকরের তাহা চিত্রাদর্শ, নরের তাহা বাঞ্ছনীয়। ধন্য অজিত! তুমি পরম ভাগ্যবান্! কমলাবতী মুরলীগুঞ্জনতুল্য মধুরস্বরে বলিল, "আপনি লালা রাম সিংহের কাছ থেকে আসিয়াছেন?"

বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বীরেন্দ্র বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।"

"কি দরকার?"

"তিনি একখানি পত্র আপনার পিতামহ ঠাকুরের হাতে দিবার জন্য আমাকে পাঠাইযাছেন। সে চিঠী অন্য কারোও হাতে দিতে পারিব না, ক্ষমা করিবেন।"

মৃদুহাসিয়া কমলাবতী বলিল, "আমি পাছে চিঠী চাই, তাই পূর্ব্ব হইতেই আপনি আমার মুখবন্ধ করিলেন। আপনি খুব কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখিতেছি। বেশ, আমার সঙ্গে আসুন।"

কমলাবতী রাজ্ঞী মহিমায় শরতের তরল মেঘের ন্যায় ললিত কোমল ভঙ্গিমায লঘুপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। মুগ্ধহৃদয় বীরেন্দ্র তাহার পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক একটি গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। বীরেন্দ্র প্রথমে নত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন, তৎপরে তাহার হস্তে পত্রখানি প্রদান করিলেন। তিনিই সুজন সিংহ—সুজন সিংহ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন, তাহার পর শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ ডেস্কোর ভিতরে এক তাড়া চাবী আছে, সেই তাড়াটি লইয়া যান্।"

বীরেন্দ্র সুজন সিংহের কথামত ডেস্কোর ভিতর হইতে চাবীর তাড়াটি বাহির করিয়া লইলেন, তাহার পর সুজন সিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বীরেন্দ্র বিপাকে

রজনীর সূচিভেদ্য অন্ধতামসে বসুধার মুক্তজনতা এবং কল-কোলাহল যখন প্রায় স্থগিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া চারিদিকে গভীর সুষুপ্তির শুভাগমনবার্ত্তা প্রচারিত করিয়া দিল, বীরেন্দ্র রাও তখন সন্দেহব্যাকুলিতচিত্তে নির্দ্ধারিত স্থানে গিয়া বিপুল অন্ধকারের মধ্যে আত্মপ্রচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বীরেন্দ্রের মনে তখন নানা প্রশ্ন উত্থিত ও লয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, "বৃদ্ধ রাম সিংহের মস্তিষ্ক অতি বার্দ্ধক্যে বোধ হয়, বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা ব্যবসায়ী গোয়েন্দা যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অকৃতকার্য্য হইল, সে কাজে আমি কি সফলতা দেখাইতে পারিব? আচ্ছা, কাহাকেই বা এখানে দেখিতে পাইব? চোরের কি এত সাহস হইবে যে, পুনর্ব্বার এখানে মাথা গলাইতে সাহসী হইবে? না, আর ভাবিতে পারি না—উঃ! মশাগুলা দেহের সমস্ত রক্ত যে শোষণ করিয়া লইল। এমন ঝঞ্ঝাটে কাজে একমাস ত দূরের কথা, আর একদিনও থাকিতে পারিব না। যার জিনিষ চুরি গিয়াছে, সেই বুঝুনগে, আমার এত মাথাব্যথা কেন? বাপ্! খাইয়া ফেলিল যে!"

হঠাৎ নিকটে কাহার লঘুপদনিক্ষেপ ধ্বনি হইল। বীরেন্দ্র চমকিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? যাহা দেখিলেন, তাহাতে বীরেন্দ্রের আপাদমস্তক

কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আপনার চক্ষুকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ভিত্তিবিলম্বিত লণ্ঠনের আলোকে বীরেন্দ্র স্পষ্ট দেখিলেন, কমলাবতী ভীতভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

হঠাৎ সেই সময়ে একটা মশক বীরেন্দ্রের নাসিকার উপরে মহা বিক্রমে হুল ফুটাইয়া দিল। যুগপৎ বিস্ময় ও যাতনায় বীরেন্দ্র অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন।

নিশাচরী কমলাবতী দ্রুতচরণে গভীর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। বীরেন্দ্র সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রেতভয়গ্রস্ত স্তম্ভিতের ন্যায় বিস্ময়মূক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

* * * *

রাম সিংহ কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহাকে দেখিয়াছ, বলিবে না?"

ম্লানভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে বীরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "না।"

"হতভাগ্য যুবক! তবে আমার এখানে কি করিতে আসিয়াছ? দেখিতেছ না, এত বড় কারবারটা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ইহাতে আর কাহারও কিছু না হোক, আমার আর সুজন সিংহের সর্ব্বনাশ হইবে—তবুও বলিবে না?"

"তবু বলিব না—আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রাম সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বীরেন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বীরেন্দ্র উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। রাম সিংহ বাধা প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাও?"

"লালা সুজন সিংহের কাছে।"

"সুজনের দেখা পাইবে না।"

"তবে কমলাবতীর কাছে।"

বীরেন্দ্রের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া রাম সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার কাছে কেন?"

"দরকার আছে।"

"দরকারটা কি—শুনিতে পাই না?"

"না, মার্জ্জনা করিবেন।"

রাম সিংহ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক উত্তর দিবে?"

"কি কথা?"

"কাল রাত্রে তুমি যাকে দেখিয়াছ, তোমার বিবেচনায় তাকে চোর বলিয়া বোধ হয় কি না?"

"না, তা স্বপ্নের অগোচর।"

রাম সিংহ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বীরেন্দ্র রাও! এ পৃথিবীতে স্বপ্নের অগোচর কিছুই নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তুমি কমলাবতীকে কাল রাত্রে দেখিয়াছ।"

বীরেন্দ্র একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অনেক কষ্টে মৃদুস্বরে বলিলেন, "না, না, আপনি অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতেছেন।"

"বটে, তুমি কমলাবতীকে দেখ নাই?"

"আমি ভুল দেখিয়াছি।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিয়া রাম সিংহ ধীরে ধীরে বলিলেন, "একে কাঞ্চন, তার কামিনী তার পর আবার ভুল! একেবারে ত্রিবেণী সঙ্গম। এইরূপ যোগাযোগ বারকতক হইলেই পৃথিবীটা রসাতলগত হইবে। হায় রে সুন্দর মুখ! হায় রে চলচলে

চাহনি। বীরেন্দ্র তোমাকে আর দোষ দিব কি, আমার বুড়ো মাথা, এখনও রূপের চমকে ঘুরিয়া যায়—আর তুমি ত যুবকমাত্র; কিন্তু জানিও, সৌন্দর্য্যের অন্তরালে জগতে অনেক কাজ হয়। যেমন সাপ দেখিতে বড় সুন্দর, ভিতরটা কালকুটে ভরা। যেমন ভ্রমর সাদা পদ্মে বসিলে চোখ ফিরাইতে পারি না, কাছে আসিলে হুলের ভয়ে পলাইবার পথ খুঁজি। যেমন মাকাল ফলের বাহির দেখিলে মুগ্ধ হই, ভিতর দেখিলে ঘৃণায় ফেলিয়া দিই।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রাম সিংহ কহিলেন, "যাক্ সে কথা, আমার একটি অনুরোধ রাখ। আর দিন কয়েক তুমি রাত্রে পাহারা দাও, তার পর পেট ভরিয়া কমলাবতীর রূপ-সুধা পান করিও। কি বল হে।"

বীরেন্দ্র, রাম সিংহের বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। কোন কথা কহিতে পারিলেন না। লজ্জানতমুখে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাম সিংহ ড্রয়ারের ভিতর হইতে একটা অতি সুন্দর ক্ষুদ্রায়তন রিভলবার বাহির করিলেন। বলিলেন, "বীরেন্দ্র! এই অস্ত্রটি তুমি লও, ইহাতে ছয়টা দাগা কার্টিজ আছে, তা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করিবে; কিন্তু সাবধান, সহসা ঘোড়া টিপিয়ো না—কেবল শত্রুকে ভয় দেখাইবে মাত্র।"

* * * *

বাড়ী ফিরিবার পথে অজিতের সহিত বীরেন্দ্রের দেখা হইল। এই কয়দিন গোলমালে পড়িয়া অজিতের সহিত বীরেন্দ্রের দেখা হয় নাই। আজ অজিতকে দেখিয়া বীরেন্দ্রের চিন্তাকাতর-মুখ প্রসন্ন হইল। যথার্থ বন্ধুর অসময়ে দেখা পাইলে মানুষের

মনে প্রকৃতই বড় আনন্দ হয়। অজিত বীরেন্দ্রের যথার্থ বন্ধু, কাজেই বীরেন্দ্র আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, "কি হে অজিত ? এত ব্যস্ত হইয়া চলিয়াছ কোথায় হে ?" বলিয়া অজিতের দোদুল্যমান হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন। অজিত সহাস্যবদনে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। অজিত সদানন্দ লোক। লোকে বলে, অজিতের মুখে কখনও কেহ বিষাদের ছায়া দেখে নাই। অজিতের আরও অনেক গুণ আছে। তিনি এত খোলাখুলি ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেন যে, পরম শত্রুও পরম মিত্রে পরিণত হইত।

অজিত বলিলেন, "ভাই বীর যে! কোথায় যাইতেছি, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? যদি জিজ্ঞাসা করিলে ত বৈজ্ঞানিক কবির ভাষায় বলি, যথায় আমার চোখের ইলেক্‌ট্রিকের আলো, গ্রীষ্মে আমার ইলেক্‌ট্রিকের ফ্যান্‌, বুকের জামার আমার সোনার বোতাম, রূপে চারিদিক অন্ধকার করিয়া বসিয়া আছেন, সেইখানে যাইতেছি।"

বীরেন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈজ্ঞানিক কবি, সোনার পাথর বাটীর মত কোন রকম জিনিষ নাকি হে ?"

অজিত বলিলেন, "আরে ছুয়ো! এটাও ছাই জান না ? কবি জিনিষটাই তথাকথিত সোনার পাথর বাটী। সকল তাতেই তাদের সেন্টিমেন্টালিটি। সাধারণ কবিরা বলে, 'সূর্য্য উঠিতেছে' আর বৈজ্ঞানিক কবি বলেন, 'পৃথিবী একবার ঘুরিল।' সূর্য্য ত অচল, পৃথিবীই ঘোরে। বৈজ্ঞানিক কবি বড় খাঁটি কথা বলেন, তাই তাঁর বচন দুই-একটা আওড়াইয়া দিলাম।"

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্জ্জুন সিংহের কোন সংবাদ জান ?"

অজিত মুখ বিকৃত করিয়া ঘৃণাবিচ্ছুরিতকণ্ঠে বলিলেন, "সেই হতভাগাটার কথা জানিতে চাও? শুনিতেছি, সে নাকি আবার রাওলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। নাও—একটা সিগারেট খাও।"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "তুমি ত জানই, ওসব আমি খাই না—ওটা ভারি——"

বাধা দিয়া অজিত কহিলেন, "খবরদার! সিগারেটের নিন্দা করিলে এখনি মাথা ভাঙিয়া দিব। তুমি একটি ব্যাড বয়।"

বীরেন্দ্র বলিলেন, "আর তুমি?"

অজিত হাসিয়া বলিলেন, "বিশেষণ চাও? দাঁড়াও মনে করি। হাঁ হইয়াছে, আমি দিনকতক বাংলা শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, বাংলা ভাষার প্রথম ভাগে গোপালের গল্পে। আছে, 'গোপাল অতি সুবোধ ছেলে। সে যা পায়, তাই খায়।' আমিও তদ্বৎ। ভাই! প্রাণটা বিরহ জ্বরে জ্বর জ্বর হইয়া উঠিয়াছে। আমি এখন আসি।"

অজিত প্রস্থান করিলেন।

বীরেন্দ্র সন্দেহাকুলিতচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, গত কল্যকার রজনীর ঘটনার সহিত অর্জ্জুন সিংহের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একি স্বপ্ন

নিমন্ত্রণের গন্ধ পাইয়া মশক মহাশয়গণ যখন কন্সার্ট বাজাইতে বাজাইতে ছুটিয়া আসিল এবং অধ্যবসায়সহকারে বীরেন্দ্রের শোণিতপুষ্ট অঙ্গের সহিত ও আপনাদের হুলের সহিত তীব্র মধুরতর সম্বন্ধ পাতাইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন বীরেন্দ্রের দ্বিতীয় নম্বরের বিপত্তি বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

তিনি প্রথমে দুই-একবার অঙ্গ নাড়া দিয়া সমাগত জীবকুলের সহিত আপনার আলাপ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মানুষই যখন বিনিপয়সার ভোজের লোভ ছাড়িতে পারে না, তখন মশারাই বা ছাড়িবে কেন? অতএব বীরেন্দ্র রাগিয়া উঠিলেন এবং অনেক করনিপাত করিলেন।

হঠাৎ ধনাগারের বৃহৎ দরজা অতি ধীরে খুলিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে একটি দীর্ঘ আলোকরশ্মিরেখা ধনাগারের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বীরেন্দ্রের রক্ত হিম হইয়া গেল। আবার এখানে চোর! এতদূর সাহস তার! বীরেন্দ্র এক লম্ফে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ত্বরিতপদে ধনাগারের দিকে ধাবিত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার বোধ হইল, যেন কেহ তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতেছে। বীরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতের পদশব্দ থামিয়া গেল। ভীতচিত্তে বীরেন্দ্র বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে রিভলভার বাহির করিলেন।

একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক্ দেখিয়া লইলেন। তাহার পর আবার অগ্রসর হইলেন। ধীরে ধীরে ধনাগারের দ্বারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। উঁকি মারিয়া ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন। একজন লোক আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়া লৌহ সিন্দুকের কলে চাবী লাগাইতেছে। হঠাৎ হস্তস্খলিত হইয়া বীরেন্দ্রের রিভলভারটি সশব্দে গৃহতলে পড়িয়া গেল।

সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া চোর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একলম্ফে দাড়াইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার জীবনহীন দেহ ভূমিচুম্বন করিল, মুহূর্ত্তমধ্যে একটা রমণী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সে কমলাবতী!

*   *   *   *   *

এই আকস্মিক ঘটনায় বীরেন্দ্র একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া বীরেন্দ্র ব্যগ্রভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, কমলাবতী সাশ্রুনয়নে চোরের মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছে। বীরেন্দ্র সাগ্রহে মৃতব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এ কি এ! হা ভগবান্!!

বীরেন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া গেল। যেন পদতলে মৃত্তিকা দুলিতে লাগিল, টলিয়া তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

যাহা কেহ কখনও কল্পনা করে নাই, আজ তাহাই সত্যে পরিণত হইল।

জড়িতস্বরে বীরেন্দ্র বলিলেন, "কমলাবতী। ইহা সত্য না, স্বপ্ন?"

কাঁদিয়া কমলাবতী বলিল, "ইহা সত্য—কঠোর সত্য !"

"তুমি এখানে কেন ?"

"বীরেন্দ্র রাও ! আপনি বোধ হয় জানেন, আমার পিতামহ এই কারবারের প্রধান অংশীদার। আর আমি তাঁর উত্তরাধিকারিণী। এই কারবার উঠিয়া গেলে আমরা পথের ভিখারী হইব। আমার পিতামহ এই চুরিতে আপনার উপরে সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার আপনার উপরে সন্দেহ হয় নাই। কেন, তাহা আপনার আর শুনিয়া কাজ নাই। তার পর শুনিলাম, রাম সিংহ আমার উপরে সন্দেহ করিয়াছেন। শুনিয়া আমার মনে বড় দুঃখ উপস্থিত হয়, রাগও যে হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। সেই রাগ আর দুঃখের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমি আজ তিন-চারি রাত্রি এইখানে আসিয়া লুকাইয়া থাকিতাম কারণ আমি জানিতাম, যতদিন ডিটেক্‌টিভের নজর এই কারবারের উপর থাকিবে, ততদিন চোর এখানে আসিবে না। এখন পুলিস এ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে, কাজেই চোরও আবার আসিয়াছে। কিন্তু চোর যদি জানিত, আমরা এখানে পাহারা দিই, তাহা হইলে কখনও এ পথ মাড়াইত না।"

চোরের নাম জানিতে পাঠকের অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে, নয় ? চোর আর কেহ নয়, কমলাবতীর ক্রোড়স্থ মৃতদেহ আর কাহারও নয়—সে অজিত সিংহ !

ম্লান ও শুষ্কস্বরে বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলাবতী ! তোমার সঙ্গে অজিতের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল ?"

কমলাবতী বলিল, "হাঁ, কিন্তু আমি অজিতকে ভালবাসিতাম না। কারণ, অজিত কেবল আমার টাকার লোভেই আমাকে

বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। বিশেষতঃ সে লুকাইয়া মদ খাইত, আর জুয়া খেলিত। খেলায় হারিয়া তার অনেক টাকা দেনা হইয়াছিল, তাই সে হীরার কণ্ঠী চুরি করিয়াছিল। তার পর আজ আবার আসিয়াছিল। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে পাপীর পরিত্রাণ নাই। আমি অজিতকে ভালবাসিতাম না সত্য, কিন্তু তার এই শোচনীয় মৃত্যুতে আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি না—ভগবান্! অজিতের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

কমলাবতী কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপসংহার

একমাস কাটিয়া গিয়াছে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে বসন্ত আসিয়াছে। পাখী গাইতেছে, তরু-শীর্ষ নাচিতেছে, নির্ঝরিণী কলহাসি হাসিতেছে। দূরে তুষারভূষণ হিমাচল লঘুমেঘবিমর্দ্দিত নিবিড়নীলগগনপ্রান্ত চুম্বন করিতেছে। জলদালঙ্কৃত শৃঙ্গমালা বালারুণকিরণদীপ্ত। খণ্ডশৈলশ্রেণীর মধ্য দিয়া উপলব্যথিতা হইয়া নদী কলগানে প্রকৃতির বীণায় যেন ভৈরব রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিয়াছে। যুবকযুবতীর হৃদয়বীণার সপ্ততন্ত্রীও যেন মোহনঝঙ্কৃতি তুলিয়াছে। ক্ষুদ্রচঞ্চলবীচিলীন তটশোভিনী কুসুমিতা জলবল্লরী প্রভাতপবনহিল্লোলে দুলিতেছে। এই বসন্তের রবিকরস্নিগ্ধ প্রভাতে শ্যামল প্রকৃতিজননীর স্নেহ-অঙ্কাশ্রিত তরুণ-তরুণীর তরুণ অন্তরে আজ কত কথা, কত

হাসি, কত গান, কত কাহিনী ভাসিয়া উঠিতেছে। তুমি প্রকৃতির লীলারম্য শোভা দেখিতে চাও না, কিন্তু প্রকৃতিও লুকাইয়া থাকে না। সে তোমাকে ভুলাইবে, হাসাইবে, মাতাইবে, মোহিত করিবে। তোমাকে স্নেহাঙ্কে টানিয়া লইবে, তোমার শ্রবণে মধুবর্ষণ করিবে, তোমার দুঃখদিগ্ধ ললাটে সমীরণ স্নিগ্ধকর বুলাইয়া দিবে, তোমার হিমশীতল কলেবর বালারুণ কিরণতপ্ত করিয়া দিবে। তুমি মাতাকে ভুলিতে পার, কিন্তু মা ত ছেলেকে ভুলিয়া থাকে না। মায়ের এই স্বার্থশূন্য স্নেহে নিখিলবিশ্ব কর্ম্মকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ। যেখানে সন্তান কাঁদে, মা সান্ত্বনা দেন না, সেখানে জগতের শৃঙ্খলা কোথায়? মা আছেন, তাই জগত সুনিয়মবদ্ধ। প্রকৃতি আছেন, তাই জগৎ প্রেমের রাজ্য। প্রকৃতি আমাদের জননী, আমরা তাঁহার সন্তান। তাই আগে প্রকৃতি, পরে পুরুষ। তাই শবাসনা প্রকৃতি, চরণতলশায়িত পুরুষের বক্ষোরূঢ়া। আনন্দই ব্রহ্ম, প্রকৃতিই আমাদের আনন্দ দেন। এই প্রকৃতিসাধনা শিখ—ব্রহ্মলাভ করিবে। নহিলে বেদালোচনা বৃথা, বাইবেল অধ্যয়ন করা বৃথা—কোরাণ পাঠ বৃথা!

* * * * *

শৈলের উপরে যুবক যুবতী বসিয়া এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য তৃপ্ত চক্ষে দেখিতেছে। যুবক বীরেন্দ্র, যুবতী কমলাবতী। দেখিয়া দেখিয়া যুবক মুগ্ধ হইল। যুবতীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সপ্রেমে তাহার লজ্জারক্ত চূর্ণকুন্তলশোভিত কপোল চুম্বন করিল। যুবতীর মৃণালভুজ যুবকের গলদেশে বেষ্টিত হইল।

উপভোগেরও একটা মাহেন্দ্রক্ষণ আছে। সঙ্গে তোমার প্রণয়িনী, বয়সে তুমি যুবা, হৃদয়ে তোমার এখন সুখের উৎস, বিশ্ব

তোমার নেত্রে এখন কবির স্বপ্ন, পরিমল তোমার কাছে এখন একটা সুগীত সঙ্গীতের রেস—এ সময়ে তোমার প্রাণটা যতই গন্ধময় হউক না কেন, তুমি মুগ্ধ হইবে, তৃপ্ত হইবে, সুখী হইবে। বালঃতপন এখন বড়ই মনোমদ, পাখীর গান এখন বড়ই মধুর। প্রকৃতি এখন বড়ই সুন্দর, প্রিয়ার আনন এখন বড়ই আবেশ-ঢলঢল।

বীরেন্দ্র প্রণয়স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কমলা, সত্যই কি তুমি আমাকে ভালবাসিতে ?"

কমলাবতী বীরেন্দ্রের প্রশস্তবক্ষে আপনার ক্ষুদ্র মস্তক রক্ষা করিয়া বীণানিন্দিতকণ্ঠে বলিল, "আজ একি প্রশ্ন বীরেন্দ্র ? উঃ! কি নিষ্ঠুর তুমি! এখনও কি তুমি আমাকে সন্দেহ কর ? প্রথম দর্শনেই তোমার স্মৃতি আমার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তোমাকে সন্দেহের ছায়া হইতে সরাইতে, আমি রমণী হইয়াও তেমন দুষ্কর কাজে ব্রতী হইয়াছিলাম। রমণী যাকে ভালবাসে, তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তার পদে তৃণাঙ্কুর পর্য্যন্ত বিঁধিতে দেয় না।"

এমন সময়ে হঠাৎ তাহাদিগের পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "আর যাকে ভালবাসে না, তাকে নরকের আগুনে ফেলিয়া দিয়াও সন্তুষ্ট হয় না।"

উভয়ে চকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল যে, যষ্টিহস্তে বৃদ্ধ রাম সিংহ মহা সহাস্যবদনে দাঁড়াইয়া আছেন।

উভয়ের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কমলাবতী স্বীয় বসনে মুখ ঢাকিল।

বীরেন্দ্র বলিলেন, "তা—তা—আপনি, আপনি——"

রাম সিংহ বলিলেন, "রাগ করিও না, আমার কোন দোষ নাই। একটু বায়ুভক্ষণে বাহির হইয়াছিলাম। একটু নির্জ্জন জায়গা খুঁজিতেছিলাম। তা কে জানে ভাই, এখানে আবার ঝোপের আড়ালে যুবক-যুবতীর আলিঙ্গন, চুম্বন, প্রেমালাপের অভিনয় হইতেছে। তা তোমরা বেশ করিয়াছ দাদা, আর দিদি তুমিও বড় কম নও—বসন্তের এমন মলয়পবনসেবিত প্রভাতটা গন্ধময় করিয়া না তুলিয়া সেটাকে পদ্মরসসিক্ত করিয়া খুব বুদ্ধিমানের মত কাজই করিয়াছ। হায় রে! সে সুখের যৌবন আর নাই—যুবতীর কাছে গেলে সে মাথার পাকা চুল তুলিতেই আগে ব্যগ্র হয়! ঐ শোন, কোকিল ডাকিতেছে! অভাগা অজিত বেচারী কেবল ফাঁকে পড়িয়া গেল, কোকিলের এমন মধুর ঝঙ্কারে একবার সাড়া দিতে পারিল না।"

বৃদ্ধ রামসিংহের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র ও কমলাবতীর নয়নও শুষ্ক ছিল না।

সমাপ্ত।

বিধির নির্ব্বন্ধ

(বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোন স্থানে একজন নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা ভাবিলেন, "চিরকালই রাজা-রাজড়ার পুত্র-কন্যার বিবাহ লইয়া অনেক বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। একটা-না-একটা তুমুল কাণ্ড যেন বাধিবেই বাধিবে। আমার একমাত্র কন্যা এখন বয়স্থা। আমি, তাহার বিবাহের জন্য গোপনে গোপনে এমন এক পাত্র স্থির করিব যে, আর কোন গোলযোগ ঘটিবে না।" এই স্থির করিয়া মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করতঃ মনোগত অভিপ্রায় কাহাকেও জ্ঞাত না করিয়া রাজা দেশপর্য্যটনার্থ বহির্গত হইলেন। বহুদিন গত হইল, তথাপি তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন, তখনই তথা হইতে পত্র প্রেরণ করিয়া আপনার কুশলসমাচার এবং অন্যান্য সংবাদাদি মন্ত্রী ও রাজ্ঞীকে জ্ঞাত করিতেন, এইমাত্র।

এদিকে রাজ্ঞী আপনার কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া প্রত্যেক পত্রেই রাজাকে তাহার বিবাহের বিষয় বিবেচনা করিতে লিখিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহারাজ সে সকল কথায় যেন

কর্ণপাতও করিতেন না। অবশেষে রাজ্ঞী স্থির করিলেন, "কন্যা বয়স্থা, মহারাজও এ সময়ে রাজ্যে অনুপস্থিত; অতএব আমিই এ বিবাহের উদ্যোগ করি।" এই স্থির করিয়া তিনি নানা স্থানে পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘটক প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। ঘটকগণ নানা স্থান হইতে নানা রাজ-পুত্রের সন্ধান আনিতে লাগিল।

অনেক সন্ধান লইয়া ও মহারাজের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া রাজ্ঞী অবশেষে একস্থানে কথা স্থির করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে মহারাজ নানা দেশ-বিদেশ—নানা রাজ্য পরিদর্শন করিয়া এক বহুসৎগুণসম্পন্ন রাজকুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া (এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়া) স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই এই আদেশ দিলেন, "আগামী ১৭ই বৈশাখ আমার কন্যার বিবাহ—আমি পাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছি। আজ হইতে পঞ্চদশ দিবস রাজ্য-মধ্যে মহোৎসব হইবে। প্রতি রজনীতে আলোকমালায় আমার সমস্ত রাজ্য আলোকিত থাকিবে। আজই বন্দী ও ভাটগণকে নানা দেশ-বিদেশে প্রেরণ কর। শত শত ব্রাহ্মণকুমারকে এই নিমন্ত্রণকার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। আজ হইতে যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই আরম্ভ করা যাউক।"

রাজাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। রাজ্যে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রাজ্ঞী এ সকল কোন বিষয়ই অবগত ছিলেন না। হঠাৎ যখন শুনিলেন যে, মহারাজ কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি

যদি জানিতেন যে, মহারাজ পাত্র স্থির করিবার জন্যই দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি আর উদ্যোগী হইয়া অন্য পাত্র স্থির করিতেন না। এখন এ উভয়সঙ্কট! তিনিও যে তারিখে যে লগ্নে কুমারীর বিবাহের কথা স্থির করিয়াছেন; রাজাও ঠিক সেই তারিখে সেই লগ্নে কন্যার বিবাহার্থী অন্য এক পাত্র স্থির করিয়া উপস্থিত। কোথায় তিনি রাজার অপেক্ষায় রাজ্যে মহোৎসবের আদেশ প্রচারিত করিতে যৎকিঞ্চিৎ কাল-বিলম্ব করিতেছিলেন, না একেবারে হিতে বিপরীত ফল দাঁড়াইল!

আপনার কার্য্যকে কেহ অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে এ পৃথিবী স্বর্গধাম হইত; কাহারও সহিত কখনও কাহারও বাদবিসম্বাদ হইত না। এত মতভেদ—এত পার্থক্য কুত্রাপি আর দৃষ্টিগোচর হইত না।

এই সূত্রের প্রমাণানুসারে রাজ্ঞীও আপনার মনোনীত পাত্রকে (রাজকুমারকে) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ইহারই সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। মহারাজ যে পাত্র স্থির করিয়াছেন, তাহা অত্যুৎকৃষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধানে আমার মনোনীত পাত্রসম্বন্ধে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে ইহা অপেক্ষা উত্তম হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। অতএব আমি এই পাত্র ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না। এ রাজপুরে না হয়, আমি গোপনে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া কন্যার বিবাহ দিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া রাজ্ঞী গোপনে গোপনে কন্যার বিবাহের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার নিজ মনোনীত পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন।

এদিকে মহারাজ মহোৎসবে মত্ত। দেশবিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত রাজা, মহারাজ, সম্রাটগণের আতিথ্য-সৎকারে নিযুক্ত। বিন্দুমাত্র সময়ও তাঁহার নিকট এখন বহুমূল্য বলিয়া অনুভূত; রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করাও বড় ঘটিয়া উঠে না। যদিও বা দিনান্তে এক-আধবার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেও রাজ্ঞী তাঁহার প্রাণের কথা খুলিয়া বলেন না। কারণ যদি বলেন, তাহা হইলে হয় ত মহারাজ সে বিষয়ে অমত করিতে পারেন। এইরূপে দুই পক্ষেই বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠিক এই সময়ে বৈকুণ্ঠে একজন দেবদূত বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্! মর্ত্তে ঐ যে একটি নরপতির একমাত্র দুহিতার বিবাহ লইয়া এত মহোৎসব দেখিতেছি, উহার কি ঐ রাজপুত্রের সহিতই বিবাহ হইবে?"

বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীমধুসূদন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না, যাহার সহিত বিবাহ হইবে, তাহা তোমায় পরে বলিব। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, সে বিবাহের আয়োজন তুমিই করিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ এই বিবাহ লইয়া এক বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্রম হইতেছে; তাহা বলি শুন।" এই বলিয়া ভগবান্ আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আর একটি বিষয় জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। রাজা ও রাণী উভয়ের মনোনীত এই যে দুই রাজকুমার আপাততঃ বিবাহের জন্য আগতপ্রায়—ইহাদের মধ্যে কাহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইবে ? রাজরাণী কি গোপনে কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন ?"

শ্রীহরি প্রফুল্লমুখে উত্তর দিলেন, "বৎস! বিধির লিখন কখনও খণ্ডন হয় না। রাজকুমারীর ললাটে যাহা আছে, তাহাই হইবে। ঐ যে রাজকারাগারে অন্ধকারকক্ষে একজন বন্দী ক্ষুণ্ণ মনে শূন্যদৃষ্টিতে বসিয়া আছে, উহারই সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইবে।"

দেবদূত কারাগারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিলেন। তাহার মলিন বসন, শীর্ণ শরীর, অপকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বড় ঘৃণা হইল। তৎপরে নিয়তির লিপির উপর তাঁহার বড় ক্রোধ হইল; তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "না, তা কখনই হইতে দিব না। এমন শচীসদৃশা চম্পকবর্ণা রাজকুমারীর সহিত একটা অপকৃষ্ট জীবের বিবাহ হইবে ? আবার 'আমিই তাহার আয়োজনকারী!' ভাল, আজ দেখিব, কেমন করিয়া বিধাতার লিপি পূর্ণ হয়।" এই স্থির করিয়া দেবদূত বৈকুণ্ঠধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়া মর্ত্তে অবতরণ করিলেন। ভগবান্ও ভক্তের ভাব অবলোকন করিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিলেন, এবং দেবদূতের দূরদৃষ্টিশক্তি হরণ করিলেন।

এদিকে দেবদূত মর্ত্তে আসিয়া মায়ায় মানবাকার ধারণপূর্ব্বক কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বন্দী চমকিয়া উঠিল।

দেবদূত কহিলেন, "বন্দি! তুমি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর ?"

বন্দী। আপনি কে ?

দেবদূত। আমি যেই হই, তোমায় মুক্ত করিবার ক্ষমতা আমার আছে—তুমি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর ?

বন্দী। কারাগারের মধ্যে এমন কে বন্দী আছে যে, মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে না ; কিন্তু মহাশয়! শুনিতেছি, সম্প্রতি রাজ-কন্যার বিবাহ হইবে। অনেকদিন হইল, উত্তম আহার আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

দেবদূত। আমি তোমায় যথেষ্ট উত্তম আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিব। রাজকন্যার বিবাহের আশায় তোমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে না।

বন্দী সম্মত হইল। দেবদূত মায়াবলে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বন্দী, কারাগৃহ হইতে বাহির হইল। দেব-দূত তখন মায়াবলে তাহাকে অচৈতন্য করিয়া, শত সহস্র যোজন দূরবস্থিত এক পর্ব্বত-শিখরোপরি বিস্তৃত উপত্যকায় লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন। কোথায় নরকসদৃশ ভীষণ কারাগার, আর কোথায় এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আধার স্বর্গোপম মনোহর স্থান! এই সকল অভাবনীয় ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বন্দীর এক প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইল।

দেবদূত কহিলেন, "দেখ, তোমায় আমি উদ্ধার করিলাম ; কিন্তু আর একটি কার্য্য এখনও বাকী আছে। আমি তোমার জন্য আহার-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে চলিলাম। তুমি ততক্ষণ এই নির্জ্জন উপত্যকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে আপনার মন-

প্রাণ পুলকিত কর। আমি চলিলাম, দুই-চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার সন্ধান লইব। তোমায় প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য বস্তু প্রদান করিব।"

এই সকল কথা বলিয়া দেবদূত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বন্দী বহুকাল পরে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে রাজ্ঞী গোপনে কুমারীর বিবাহ দিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। কেবল দুহিতাকে গোপনে রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া আপন পিত্রালয়ে প্রেরণ করিতে পারিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। রাজ্ঞী তাহারই আয়োজন করিতে সম্পূর্ণ ব্যগ্র।

একজন বিশ্বস্ত দাসীকে রাজ্ঞী বলিলেন, "দেখ, আমাদের সকল কৌশলই সফল হইয়াছে; কিন্তু দুহিতাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করি কেমন করিয়া?"

দাসী কহিল, "নিকটেই আপনার প্রিয়সখীর বাটী। আপনি একটি বৃহৎ 'চেঙারীতে' রাজকুমারীকে বসাইয়া, চতুর্দ্দিকে শালপাতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়া তদুপরি

নানাবিধ মিষ্টান্ন সাজাইয়া দেন। আমি চারিজন বাহককে রীতিমত উৎকোচ প্রদানানন্তর বশীভূত করিব। তৎপরে সেই 'চেঙারী' আপনার প্রিয়সখীর বাটীতে লইয়া যাইতেছি'— এই ছল করিয়া, রক্ষিগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক পুরী হইতে বাহির হইব। অনতিদূরে আপনার পিত্রালয়-প্রেরিত রথ অবস্থান করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। আমি তাহাতেই উক্ত 'চেঙারী' রক্ষিত করিয়া বাহকগণকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিব। তৎপরে তাহারা চলিয়া আসিতে-না-আসিতেই, দ্রুতগামী অশ্ব সহযোগে রথ এতদূরে গিয়া পড়িবে যে, তথায় যদি আমি রাজকুমারীকে মুক্ত করিয়া দিই, তথাপি তাহাকে কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

এ অতি উত্তম পরামর্শ। রাজ্ঞী তাহাতে সম্মতা হইলেন। পরামর্শমত কার্য্যও অতি দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল।

যে সময়ে দাসী, চারিজন বাহকের স্কন্ধে সেই গুরুভার অর্পণ করিয়া রাজপথ দিয়া চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই দেবদূত ছদ্মবেশে রাজবাটীর অভিমুখে ধাবিত হইতেছিলেন। এই সময়ে উত্তম আহারীয়-দ্রব্য-পূর্ণ এক 'চেঙারী' তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি চকিতের ন্যায় বাহকদিগের মধ্যে পতিত হইয়া, আহারীয় দ্রব্যসহ সেই 'চেঙারীখানি' ছিনাইয়া লইয়া, শনৈঃ শনৈঃ শূন্যপথে উত্থিত হইলেন। বাহকেরা অবাক্ হইয়া রহিল। দাসী তদ্দৃষ্টে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

বিধিলিপি খণ্ডন করিতে গিয়া দেবদূত যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই পাপে তাঁহার দূরদৃষ্টি লোপ পাইয়াছিল। তাই তিনি দেবদূত হইয়াও জানিতে পারেন নাই যে, সেই চেঙারীর

ভিতর কি ছিল। সুতরাং তিনি যথাবর চেঙারী লইয়া সেই পর্ব্বতের উপর বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বন্দী সেই অপরিমিত আহার্য্যবস্তু সন্দর্শনে পরম পুলকিত হইল। সে একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই, জানিতেও পারে নাই যে, উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু, কত রাজকুমারের প্রার্থনীয়—কত শত বীর, তাহার প্রাপ্তির আশায় উন্মত্ত!

দেবদূত কহিলেন, "দেখ বন্দি! তোমায় মুক্ত করিলাম—অপরিমিত আহারীয় বস্তু প্রদান করিলাম; এখন আমি নিশ্চিন্ত! তুমি এই নির্জ্জন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, বা নিকটস্থ ঐ পর্ব্বত-গহ্বরে বাস কর, অথবা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে চেষ্টা কর, যাহা ইচ্ছা হয়, করিও; আমি চলিলাম। মর্ত্তে আর আমি অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারিব না। আমার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে। আমি চলিলাম।

এই বলিতে বলিতে, দেবদূত শূন্যে উত্থিত হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র অতীত হইতে-না-হইতে, তিনি আকাশে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বন্দী চেঙারীখানি উন্মুক্ত করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে একেবারে বিস্মিত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। এই অসম্ভাবিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকনে তাহার মনের অবস্থা যে কি হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

প্রথম দিন রাজকুমারী এবং বন্দীর পরস্পর পরিচয় হইলে, উভয়ে ভিন্নদিকে প্রস্থান করিয়াছিল। কারণ, রাজকুমারী আপনার পিতৃরাজ্যের একজন সামান্য বন্দীকে বিবাহ করিবে, ইহা বন্দী স্বপ্নেও বিবেচনা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে নিরাশমনে ভিন্নদিকে প্রস্থান করি[illegible]। অপর পক্ষে, রাজকুমারীও বন্দীকে ঘৃণ্য জীব জ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে কোনরূপে পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিয়া [illegible] উপস্থিত হওয়া যায়, এমন কোন পথ আবিষ্কার করিবার [illegible] যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে; [illegible], চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু তথাপি কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বন্দীর তদ্রূপ। প্রায় ছয়মাস এইরূপে সমস্ত উপত্যকা তন্ন তন্ন করিয়াও যখন বন্দী এবং রাজকুমারী উভয়েই একপ্রকার নিরাশ হইল, তখন আবার একদিন তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল।

হায়! বিধির বিধান লঙ্ঘন করে, এমন সাধ্য কার? যাহার যে প্রকার ললাট-লিখন, তাহা যদি পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এ বিশ্ব-সংসার যথেচ্ছাচারিতায় পরিপূরিত হইত। দেখ, ছয়মাস পূর্ব্বে যে রাজকুমারী, ঘৃণায় বন্দীকে পরিহারপূর্ব্বক গর্ব্বিত মনে প্রস্থান করিয়াছিল; যাহার দিকে একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও ঘৃণা বোধ করিয়াছিল; আজ সে তাহাকে রতিপতি কামদেবের ন্যায় সুন্দর বলিয়া অনুভব করিল। আজ সে যেন অন্তরে অন্তরে জানিল, বিধাতা তাহারই সহিত তাহার মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই আজ আর তাহার ঘৃণা হইল না। ছয়মাস একাকিনী ছুটাছুটি করিয়াও কোন সাথী পায় নাই, আপনি প্রশ্ন করিয়া আপনিই উত্তর দিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিয়াছে। আজ সে বন্দীকে পাইয়া পরমানন্দে তাহাকেই আলিঙ্গন করিল। যেন তাহাতেই তাহার প্রাণ-মন তৃপ্ত হইল। সে হাতে স্বর্গ পাইল। সেই স্থানে সেই মুহূর্ত্তে গন্ধর্ব্ব-বিধানে তাহাদের বিবাহ হইল। বিধিলিপিও পূর্ণ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেবদূত ভাবিয়াছিলেন, বন্দীকে আমি সহস্র যোজন দূরস্থিত পর্ব্বত-শিখরোপরি নির্গমোপায়বিহীন এক উপত্যকায় রাখিয়া আসিয়াছি। মর্ত্তের মানবের সাধ্য কি, তথা হইতে তাহাকে লইয়া আসে? রাজকুমারী কি আজও অনূঢ়া আছে? নিশ্চয়

তাহার সেইদিনই কোন-না-কোন রাজপুত্রের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! সেই রাজকুমারীর কাহার সহিত বিবাহ হইল?"

বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীমধুসূদন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বৎস! তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা অলীক। তুমি একবার বিধিলিপি খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে বলিয়া, সেই পাপে তোমার দূরদৃষ্টি হরণ করিয়াছি। আজি আবার তাহা তোমায় প্রদান করিলাম। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ দেখি, ঐ উপত্যকার উপরে কেমন একটি ক্ষুদ্র পরিবার বিচরণ করিতেছে।"

দেবদূত তদ্দৃষ্টে অবাক্! ভগবানের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে অভয় দিয়া চরিতার্থ করিলেন।

শেষে দেবদূতের সাহায্যে রাজকন্যা পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইল। অনন্তর পরিচয়ে প্রকাশ পাইল, সেই বন্দী আর কেহই নহেন, স্বয়ং পরাক্রান্ত সিন্ধুরাজ পুত্র। তখন রাজ্যমধ্যে মহা উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল।

সম্পূর্ণ।

শত্রুর কাণ্ড

(অনুদিত)

১

ইংলণ্ডের ডানমিনিষ্টার নামক ক্ষুদ্র সহরের পুষ্পলতাসমাচ্ছন্ন সুশোভিত একখানি ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে জননী কন্যাকে বলিলেন, "প্যাটি, তুই যা কর্‌ছিস্, তা কি ভাল হচ্ছে? একটা বিদেশীর জন্য তুই এ সহরের বড় বড় লোকের প্রাণে কষ্ট দিচ্ছিস্।"

কন্যা বলিল, "মা, কেন তুমি হারিঙ্গেকে বিদেশী বল্‌ছ, জানি না। তিনি এদেশেরই লোক, এখন আমেরিকায় বাস কর্‌ছেন।"

জননী বলিল, "যাই হোক, এ দেশের হোক আর বিদেশের হোক, মেলফোর্ডের কাছে সে কিছুই নয়।"

কন্যা কহিল, "বুঝেছি, মেলফোর্ড তোমার কাছে এসে তার নামে লাগিয়েছে, কেন সে আমার কাছে এসে বল্‌তে পারে না?"

জননী কহিল, "হাঁ বল্‌ছিলই ত। তুই কি জানিস্ না যে, সে এবার প্রোমসন পেলেই আমি তার সঙ্গে তোর বে দিতে স্বীকার করেছি। এ অবস্থায় তুই কেন বল দেখি, ষ্টিফেন হারিঙ্গেকে প্রশ্রয় দিতেছিস্।"

কন্যা বলিল, "আমি তাকে কষ্ট দিব মনে করি না। মা, আমি আর এমন কাজ কর্‌ব না।"

"এই ত আমার মেয়ে প্যাটির মত কথা," বলিয়া জননী মিসেস্ থ্যাবার্ণ সস্নেহে কন্যাকে বারংবার চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মেলফোর্ড এখনই আসিবে, তার জন্যে চা'এর যোগাড় কর।"

মিসেস্ থ্যাবার্ণের স্বামী ডানমিনিষ্টার সহরের গির্জায় যাজ-কের কাজ করিতেন; কিছু টাকা রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; তাঁহারই বিধবা পত্নী তাঁহার একমাত্র কন্যা লইয়া একরূপ দুঃখে-সুখে কালযাপন করিতেছেন।

এই কন্যার নাম প্যাটি। প্যাটি এখন পরম রূপবতী, যৌবন-লাবণ্যে তাহার শরীর ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মত সুন্দরী ডানমিনিষ্টার সহরে আর কেহ ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই গানবাজনায় প্যাটির খুব ঝোঁক ছিল; সে বেশ গান বাজনা শিখিয়াছিল, এখন ছোট ছোট মেয়েদের গান-বাজনা শিখাইয়া, কিছু রোজগার করিয়া মাকে সাহায্য করে। সে বাহিরে যাহাই দেখাক না কেন, মনে মনে মেলফোর্ডকে বড় ভালবাসিত। মেলফোর্ড ডানমিনিষ্টারের ব্লাণ্ট এণ্ড কোম্পানীর বাটীতে কেরাণীর কাজ করিতেন। তাঁহার মাহিনা বৃদ্ধি হইলেই তাঁহার সহিত প্যাটির বিবাহ হইবার কথা সকলই স্থির ছিল।

তাঁহারা উভয়ে বড়ই সুখে ছিল; কিন্তু সেই সুখের মধ্যে এক বিষাদের ছায়া উদিত হইল। এই সময়ে সিমেন ডাবিজে নামক এক যুবক ডানমিনিষ্টারে আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। সকলে জানিল যে, তিনি আমেরিকার একজন মহা ধনাঢ্য ব্যক্তি, সেখানে তাঁহার অনেক জমিদারী আছে। ইংলণ্ডে কিরূপ প্রণালীতে চাষবাস হয়, তাহাই দেখিবার জন্য এ দেশে তাঁহার আগমন।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেইদিন হোটেলে বসিয়া এই ষ্টিফেন হারিঙ্গে আপনা-আপনি বলিতেছিলেন, "বটে, তারা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে? তাদেরও বড় দোষ নাই, তবে মোটে এই সপ্তাহের দিনমাত্র খবর পেয়েছি। এ সব কাজ তাড়াতাড়ির নয়, তবে আর দোষ করাও ঠিক নয়; কিন্তু কি করে সকলের অজ্ঞাতসারে মেটাকে এখানে আনা যায়, আমার মাথায় ত একটা মৎলব আস্‌ছে না—দেখা যাক্, কতদূর কি হয়। যাক্ গে, এখন একবার প্যাটির কাছে যাওয়া যাক্—সব সময়ে এক বিষয় ভাব্‌তে পারা যায় না—প্যাটিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়?"

পরক্ষণে তিনি উত্তমরূপে বেশবিন্যাস করিয়া প্যাটিদের সুন্দর কুটীরের দিকে চলিলেন। পথে আসিয়াও তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই, তিনি চিন্তিতমনে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা একজন ভিখারী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কাতরভাবে বলিল, "বড় গরীব—কিছু দিন্। দু'দিন খাই নাই—কিছু দিন্।"

ষ্টিফেন হারিঙ্গে রুক্ষভাবে বলিলেন, "যা বিরক্ত করিস্ না—তোকে দিতে আমার কাছে এক পয়সাও নাই।"

ভিখারী কাতরোক্তি করিয়া বলিল, "দয়া করুন, নির্দ্দয় হবেন না—আপনারও একদিন এমন অবস্থা হতে পারে।"

"বেটা নচ্ছার," বলিয়া হারিঙ্গে তাহার প্রসারিত হাতের উপর নিজের ছড়ীটা এক ঘা বসাইয়া দিলেন, এবং তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিলেন। সে গড়াইতে গড়াইতে পথিপার্শ্বস্থ নর্দ্দমার মধ্যে পড়িল।

ষ্টিফেন হারিঙ্গে দ্রুতপদে প্যাটিদের বাড়ীর দিকে চলিয়া

গেলেন। তখন সেই ভিখারী নর্দ্দমা হইতে উঠিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "বটে থাক, একদিন বোঝা যাবে।"

ষ্টিফেন হারিঙ্গে কুটীরে আসিয়া দেখিলেন, মেলফোর্ড তাঁহার পূর্ব্বেই আসিয়াছেন। তিনি প্যাটির সহিত মহা আনন্দে সময়াতিপাত করিতেছেন, দেখিয়া হারিঙ্গে মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু নিজ মনোভাব গোপন করিয়া প্যাটির মাতার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মেলফোর্ডের সহিত প্যাটির বিবাহ যে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি প্যাটির মাতার মুখে শুনিলেন। হারিঙ্গে এ কথা আগে হইতে জানিতেন, তবে এখন যেন কথাটা নূতন শুনিতেছেন, এইরূপ ভাব দেখাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্যাটির জননী বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন, আর হারিঙ্গের উপর মেলফোর্ডের যে রাগ ছিল, তাহাও তৎক্ষণাৎ দূর হইল। মেলফোর্ড বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত আজ হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন। সহসা মেলফোর্ড বলিলেন, "আফিসের একটা কাজে আমাকে কাল সকালের গাড়ীতেই লণ্ডন যেতে হবে। আবার বৈকালের সাড়ে চারটার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিব। আপনাদের লণ্ডনে যদি কোন কাজ থাকে ত বলুন।"

প্যাটির জননী বলিলেন, "আমাদের মত গৃহস্থের যা দরকার, তা সবই এখানে আছে—আমাদের লণ্ডনে কি কাজ?"

কিন্তু প্যাটি মেলফোর্ডের কানে কানে বলিল, "আমার জন্য সেই রকম যদি একজোড়া দস্তানা পাও ত এনো—সেই সেই রকম—যা এখানে পাওয়া যায় না।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর কুটীরবাসিনীদিগের নিকটে

বিদায় চাহিয়া মেলফোর্ড ও হ্যারিঙ্গে উভয়ে বন্ধুভাবে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া হ্যারিঙ্গে বলিলেন, "আপনি কাল লণ্ডনে যাচ্ছেন—যদি ইচ্ছা করেন ত আমার একটা সামান্য উপকার কর্‌তে পারেন।"

মেলফোর্ড বিনীতভাবে বলিলেন, "বলুন, নিশ্চয় কর্‌ব।"

হ্যারিঙ্গে বলিলেন, "আমার জন্য লণ্ডনের এক ব্যক্তি কতকগুলা জমির ভাল সার সংগ্রহ করে রেখেছেন। তিনি তার কিছু নমুনা আমাকে পাঠাতে চান্‌—আপনি যদি অনুগ্রহ করে সেটা আনেন, তবে বড় উপকার হয়।"

মেলফোর্ড বলিলেন, "এ আর শক্ত কাজ কি—নিশ্চয় আনিব, কার কাছে আছে?" হ্যারিঙ্গে বলিলেন, "আপনাকে বেশী কষ্ট করতে হবে না। আমি তাকে চিঠী লিখ্‌ব। তিনি ষ্টেসনে এসে আপনাকে সেগুলি দিবেন।"

মেলফোর্ড বলিলেন, "তিনি আমায় কেমন করে চিন্‌বেন?"

হ্যারিঙ্গে বলিলেন, "আমি আপনার নাম তাকে লিখে পাঠাব; আপনি এক গেটের কাছে দাড়াবেন, তা হলেই তিনি আপনাকে চিনে নিতে পার্‌বেন। (চকিতে) এ কি।"

এই সময়ে পথের পার্শ্বে ঝোপের মধ্যে কি একটা শব্দ হইল। মেলফোর্ড বলিলেন, "খরগোস হবে, বোধ হয়।"

হ্যারিঙ্গে বলিলেন, "বোধ হয়, মানুষ।"

উভয়ে আবার চুরুট টানিতে টানিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিলেন। বিদায় হইবার সময় হ্যারিঙ্গে আবার বলিলেন, "তা হলে আমার সেই লোকটিকে আজই চিঠী লিখে দিই।"

মেলফোর্ড বলিলেন, "হাঁ, তিনি দিলেই আমি নিয়ে আস্‌ব।"

২

যখন পরদিবস মেলফোর্ড ডানমিনিষ্টারে প্রত্যাগমন করিবার জন্য লণ্ডনের চেরিং ক্রস ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় লোকাকীর্ণ।

তিনি কথামত হারিঙ্গের বন্ধুর জন্য গেটের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার পৃষ্ঠে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন, "কেমন আছেন, মিষ্টার মেলফোর্ড?"

মেলফোর্ড ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি কেমন আছেন, মিষ্টার বার্কস্?"

বার্কস্ একজন ডিটেক্‌টিভ। মেলফোর্ড তাঁহাকে চিনিতেন, তাঁহাদের অফিসের দুই-একটা মামলায় বার্কসকে নিযুক্ত করা হয়। মেলফোর্ড বলিলেন, "এখানে কি নিজের কাজে ফিরিতেছেন?"

বার্কস্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যদিই বা তা হয়, তাহা হইলে আপনাকে বলিতে কি? তা ঠিক নয়, এখন মিসেস্‌কে একটু বেড়াইতে নিয়ে যাচ্ছি।"

এই বলিয়া বার্কস্ হাসিতে হাসিতে ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িলেন। তখন মেলফোর্ড গেটের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যদি সে আসতে আরও দেরী করে, তা হলে দেখছি, আমি ট্রেণ মিস্ করব—কি আপদেই পড়লেম।"

এই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনারই নাম কি মেলফোর্ড?"

মেলফোর্ড বলিলেন, "হাঁ, আপনি কি মিষ্টার হারিঙ্গের জিনিষ আনিয়াছেন ?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, এই নিন্। এটা বেশী নাড়া-চাড়া করবেন না—এটার ভিতরে কাঁচের জিনিষ আছে" বলিয়া একটা পুলিন্দা মেলফোর্ডের হাতে দিলেন।

তখন গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং মেলফোর্ড সেই পুলিন্দা লইয়া দ্রুতপদে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন; গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

শীঘ্রই মেলফোর্ড হারিঙ্গের পুলিন্দার বিষয় ভুলিয়া গেলেন। তিনি প্যাটির চিন্তাসুখে মগ্ন হইয়া ডানমিনিষ্টার দিকে চলিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, "প্যাটি জানে, আমি এই ট্রেণে ফিরিব; সে কি আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবে না ?"

অবশেষে গাড়ী আসিয়া ডানমিনিষ্টার ষ্টেশনে দাঁড়াইল। মেলফোর্ড জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, প্যাটি স্মিতমুখে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি এক লাফে গাড়ী হইতে নামিলেন। ছুটিয়া গিয়া প্যাটির হাত ধরিলেন। পুলিন্দার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। একজন রেলকর্ম্মচারী গাড়ী হইতে সেই পুলিন্দাটি বাহির করিয়া লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, "এটা কি আপনার ?"

মেলফোর্ড থতমত খাইয়া বলিলেন, "হাঁ।" বলিয়াই তিনি সেটা নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন।

প্যাটি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মা আমাকে কয়েকটা জিনিষ কিনতে পাঠিয়েছিলেন; আমি ভাবলেম, তুমি এই ট্রেণে আসবে বলেছিলে, তাই দেখতে এলাম।"

মেলফোর্ড আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বেশ করেছ, আমি সমস্ত রাস্তা ভাবতে ভাবতে আসছি, তুমি আসবে কি না।"

প্যাটি বলিল, "কয়েকটা জিনিষ কিনে নিয়ে যাব, সঙ্গে যাবে ?"

মেলফোর্ড বলিলেন, "তা আবার জিজ্ঞাসা করছ।"

প্যাটি বলিল, "তবে চল। কিন্তু এত বড় পুলিন্দাটা ঘাড়ে করে যাওয়া হবে না।"

"আচ্ছা, এটা ওয়েটিংরুমে রেখে যাচ্ছি," বলিয়া মেলফোর্ড ফিরিল। এবং ওয়েটিংরুমে সেই পুলিন্দাটি রাখিয়া প্যাটির সহিত হাসিতে হাসিতে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তাহারা উভয়ে প্রস্থান করিলে কয়েকজন রেলওয়ে কুলী ওয়েটিংরুমের দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে আসিল। একজন বলিল, "এ থলেটা কার ?"

সকলেই মেলফোর্ডকে চিনিত। অপর একজন বলিল, "এটা মিষ্টার মেলফোর্ড এখানে রেখে গেছেন। বোধ হয়, এখনই এসে নিয়ে যাবেন।"

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "যাই হোক, এটা ঘরের মাঝখানে পড়ে থাকলে চলবে না—ঐ সেলফের উপর তুলে রাখ।"

অপর ব্যক্তি পুলিন্দাটি তুলিয়া সবেগে সেলফের উপর ছুড়িয়া দিল।

তৎক্ষণাৎ এক ভয়াবহ কাণ্ড হইল। সহসা পৃথিবী যেন ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সহস্র বজ্র ধ্বনিত হইয়া সমস্ত ষ্টেশন কাঁপিয়া উঠিল, ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল—রেল আঁকিয়া বাঁকিয়া গেল, যাহারা তখন ষ্টেশনে ছিল, তাহারা চাপা পড়িল।

সমস্ত ষ্টেশনটি এক পলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কি হইয়াছে দেখিবার জন্য সকলে ছুটিয়া ষ্টেশনের দিকে আসিল।

এই সময়ে হারিঞ্জে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "বেশ—খুব বড় ষ্টেশন—মন্দ নয়, তবে মূর্খটা কিরূপে কি করিল, তাই ভাবিতেছি। নিশ্চয়ই চাপা পড়েছে, তার লীলাখেলা এইখানেই শেষ হয়েছে। এখন প্যাটি যায় কোথায়? সে আমার—আমার—নিশ্চয়ই আমার!"

পুলিসও সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন যাহারা চাপা পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা পাইতে লাগিল। অধিকাংশেরই একেবারে প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল; যাহারা তখনও জীবিত ছিল, তাহারা হাঁসপাতালে প্রেরিত হইল।

তখন কি ব্যাপার হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সকলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিলেন যে, কোন একটা কিছু ফাটিয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে; কোন দুরাত্মা ষ্টেশনটি নষ্ট করিবার জন্য নিশ্চয়ই কোন ভয়াবহ ডিনামাইট ষ্টেশনে রাখিয়া গিয়াছিল।

যে দুই ব্যক্তি ওয়েটিংরুম পরিষ্কার করিতে গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন গুরুতর আঘাত পাইলেও তখন জীবিত ছিল। সে বলিল, "মেলফোর্ড একটা পুলিন্দা ওয়েটিংরুমে রাখিয়া যান। সেটা সেলফের উপর রাখিতে গিয়া এই কাণ্ড হইয়াছে।"

তখন পুলিস মেলফোর্ডের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন্ধানে জানিল, মেলফোর্ড প্যাটির সহিত বাজারের দিকে

গিয়াছেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কয়েকজন কনেষ্টবলকে লইয়া বাজারের দিকে মেলফোর্ডের সন্ধানে ছুটিলেন।

ষ্টেশনে কি কাণ্ড হইয়াছে, মেলফোর্ড তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি প্যাটির সহিত হাসিতে হাসিতে ষ্টেশনের দিকে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। সাহেব বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, এইদিকে আসুন।"

তিনি প্যাটির নিকট হইতে সত্বর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে আসিলেন। তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মিষ্টার মেলফোর্ড, আপনি আপাততঃ আমার বন্দী জানিবেন।"

মেলফোর্ড অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বন্দী—কেন মহাশয়? আপনার ওয়ারেণ্ট কোথায়?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিলেন, "গোল করিবেন না, সঙ্গে আসুন। ওয়ারেণ্ট নাই—ষ্টেশন উড়াইয়া দিবার জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

মেলফোর্ড দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "ষ্টেশন উড়াইয়া দেওয়া—সে কি! কি হয়েছে?"

তিনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় কনেষ্টবলবেষ্টিত হইয়া চলিলেন। সজলনয়নে প্যাটি তাঁহার অনুসরণ করিল।

৩

ইউরোপে, আমেরিকায় এক-একদল লোক হইয়াছে, যাহা-দিগকে "অ্যানার্কিষ্ট" বলে। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীতে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র এরূপ ভেদাভেদ থাকা উচিত নহে—মানুষমাত্রেই সমান অবস্থায় থাকিবে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহারা বড়লোকের, রাজা-রাজড়ার পরম শত্রু। ইহাদের বিশ্বাস, ধনকুবেরদের মধ্যে বড় বড় জন কয়েককে অন্ততঃ খুন করিতে পারিলে, তখন সকল বড়লোকই নিজ নিজ ধন গরীব-দিগের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিবে। এই উদ্দেশ্যে ইহারা প্রধান প্রধান আফিস, ব্যাঙ্ক, গির্জ্জা, ষ্টেশন প্রভৃতি ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় থাকে। বিশ্বাস, এরূপ-ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলে বড়লোকেরা ভয় পাইয়া তাহারা যাহা চাহে, তাহা করিবে।

মেলফোর্ড এক্ষণে একজন "অ্যানার্কিষ্ট" বলিয়া সকলের নিকটে পরিচিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! লোকটাকে এত ভাল বলিয়া জানিতাম; ভিতরে ভিতরে এই কাণ্ড করিতেছিল, কি ভয়ানক!"

অ্যানার্কিষ্টদিগকে অতি ভয়ানক লোক বলিয়া সকলেই জানিত, পুলিস সেইজন্যই মেলফোর্ডকে সতর্কভাবে কারাবদ্ধ রাখিয়াছিল; কেবল তাঁহার উকীল মিষ্টার গ্যারেট ব্যতীত আর কাহারও সহিতই তাঁহাকে দেখা করিতে দেন নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বিচারে মেলফোর্ডের বিরুদ্ধে প্রমাণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। একজন রেলকর্ম্মচারী বলিল,

সে গাড়ী হইতে নামাইয়া একটা বড় পুলিন্দা মেলফোর্ডের হাতে দিয়াছিল।

আহত পোর্টার বলিল, মেলফোর্ডকে সে পুলিন্দাটি ওয়েটিং-রুমে রাখিতে দেখিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গী সেটা সেল্‌ফে রাখিবা-মাত্রই সেটা ফাটিয়া গিয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।

চেরিংক্রসের টিকিট-কলেক্টর মেলফোর্ডকে সেনাক্ত করিলেন; এবং বলিলেন, ইহাকে তিনি শশব্যস্ত হইয়া একটা পুলিন্দা লইয়া গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়াছিলেন।

ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর বার্কস্‌ সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁহার সহিত মেলফোর্ডের চেরিংক্রসে দেখা হইয়াছিল, তিনি যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

মেলফোর্ড আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য বলিলেন যে, ষ্টিফেন হারিঙ্গে তাঁহাকে তাঁহার জন্য একটা পুলিন্দা লইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার একজন বন্ধু আসিয়া একটা পুলিন্দা তাঁহাকে দিবে। এইজন্য তিনি সেই ব্যক্তির জন্য চেরিংক্রস ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পুলিন্দাটি পাইবামাত্র সত্বর গাড়ীতে আসিয়া উঠেন। এখানে প্যাটিকে দেখিয়া সেই পুলিন্দার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; রেল-কর্ম্মচারী সেটা তাঁহার হাতে দেন, তিনি সেটি ওয়েটিংরুমে রাখিয়া প্যাটির সহিত বাজারের দিকে গিয়াছিলেন।

ষ্টিফেন হারিঙ্গেকে ডাকা হইল। তিনি সমস্তই অস্বীকার করিলেন; বলিলেন, তিনি কখনই কোন কিছু আনিবার জন্য মেলফোর্ডকে অনুরোধ করেন নাই, লোকটা মিথ্যা বলিতেছে।

শুনিয়া মেলফোর্ড বিস্ফারিতনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আর কোন কথা শুনিলেন না। মেলফোর্ডকে বিচারার্থ সেসনে প্রেরণ করিলেন।

উকীল গ্যাবেট জেলে মেলফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন, "হারিঙ্গে যে সকল কথা অস্বীকার করিল, এটা আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি তার পিছনে লোক লাগাইয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই জানিতে পারি নাই। সে তোমার বিশেষ প্রশংসা করে।"

মেলফোর্ড কাতরভাবে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝিতেছি, আমার বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া রক্ষা পাইব, তাহা কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না।"

উকীল বলিলেন, "তোমার উপরে হারিঙ্গের রাগের কোন কারণ আছে?"

মেলফোর্ড চিন্তিতভাবে বলিলেন, "কই, আমি ত কিছু দেখি না—তবে—হয় ত——"

উকীল বলিলেন, "আমার কথার উত্তর হইল না।"

মেলফোর্ড বলিলেন, "সম্ভবতঃ সে প্যাটিকে ভালবাসিত, সেজন্য হয় ত রাগ থাকিতে পারে।"

উকীল চিন্তিতভাবে শিস্ দিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, "ওঃ! একজন স্ত্রীলোকও ইহার ভিতরে আছেন, তাই ত বলি। যাই হউক, এর ভিতর কিছু আছে; দেখি, যদি কিছু করে উঠতে পারি। তুমি হতাশ হয়ো না, নির্দ্দোষী কখনও কষ্ট পায় না—কাল আবার দেখা করিব।"

এই বলিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন; দেখিলেন, প্যাটি তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। উকীল বলিলেন, "খবরের জন্য ব্যস্ত হয়েছ? প্রথম—মেলফোর্ড বেশ ভালই আছে, তবে তার মোকদ্দমার বিষয়—তাহার খালাসের বিষয়—সত্য কথা বলিতে কি—আমরা এখনও বড় কিছু করে উঠ্‌তে পারি নাই। আশা করি——"

প্যাটি সজলনেত্রে বলিল, "তবে কি এখনও কোন প্রমাণ পান নাই, তিনি কখনও এমন কাজ কর্‌তে পারেন না, আমি জানি।"

উকীল বলিলেন, "আমরাও তা জানি।"

প্যাটি নিজ পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া গ্যাবেট সাহেবের হস্তে দিল; বলিল, "এই পত্রখানি একটা ছোঁড়া আমার হাতে দিয়ে পালিয়ে গেল—আপনাকে দেখাতে এনেছি।"

গ্যাবেট সেই পত্রখানি পড়িলেন;—

"যদি তুমি মেলফোর্ডের উপকার কর্‌তে চাও, তবে আজ রাত্রি এগারটার সময়ে হাঙ্গিসমেটের চৌরাস্তার মোড়ে একাকী আসিয়ো—কোন ভয় নাই, বরং মেলফোর্ডের বিশেষ উপকার হইবে।"

পত্র পাঠ করিয়া গ্যাবেট সাহেব চিন্তিত মনে শিস্‌ দিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই এ কার হাতের লেখা জান না?"

প্যাটি বলিল, "না।"

উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবে ইচ্ছা করেছ?"

প্যাটি বলিল, "আমি যেতে সাহস করি না, মা দশটার পরই শুতে যান, মনে করলে আমি লুকিয়ে যেতে পারি—কিন্তু যেতে সাহস হয় না।"

উকীল বলিলেন, "আমার পরামর্শ শোন—যাও। হয় ত ভালও হতে পারে।"

প্যাটি বলিল, "আমি কিছুতেই একা যেতে পারব না।"

উকীল বলিলেন, "একাই যেতে হবে—না হলে যে চিঠী লিখেছে, সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে না। ঐ চৌরাস্তার আসে-পাশে অনেক ঝোপ আছে—ভয় নাই, লোক কাছেই থাকবে।"

প্যাটি বলিল, "যদি তা হয়, যেতে পারি। আপনি যা বলবেন, তাই করব। মেলফোর্ড কিছু মনে করবে না ত?"

উকীল বলিলেন, "নিশ্চয় নয়, বরং তিনি এরূপ সাহসিক স্ত্রী পাবেন বলে খুব খুসী হবেন।"

কেবল মেলফোর্ডের জন্যই প্যাটি এই দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল। সে স্পন্দিতহৃদয়ে উদ্বিগ্নমনে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিল।

গ্যাবেট সাহেবও রাত্রির বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, আজ রাত্রে মেলফোর্ডের মোকদ্দমার একটা কিনারা হইবে।

প্রায় রাত্রি এগারটার সময় গ্যাবেট সাহেব দুইজন মহা বলবান্ ভৃত্যের সহিত হাক্কিসমেটের চৌরাস্তার পার্শ্বস্থ ঝোপের মধ্যে লুকাইয়াছিলেন।

৪

তিনি ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। আপন মনে বলিতেছিলেন, "এই বুড়ো বয়সে মক্কেলের জন্যে এতও কর্‌তে হলো, এই রাত্রের হিমে ভিজে এরপর কতদিন যে বাতে ভুগ্‌তে হবে, তা কেবল ভগবান্‌ই জানেন। যাই হোক, প্রায় এগারটা বাজে, বোধ হয়, প্যাটি এখনই আস্‌বে—তোমরা দুইজনে ঠিক হয়ে থাক।"

এই সময়ে বৃক্ষান্তরাল হইতে একটি স্ত্রীলোক চৌরাস্তার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিল; কিন্তু সে এই নির্জ্জন স্থানে এই গভীর রাত্রে কাহাকেও কোথায়ও দেখিতে পাইল না।

বলা বাহুল্য, এ স্ত্রীলোক আর কেহ নহে—প্যাটি। তাহার হৃদয় হইতে সাহস ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল, এবং বাড়ীর দিকে ছুটিয়া পলাইতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল। সে মনে মনে বলিল, "গ্যাবেট সাহেব বলিয়াছিলেন, নিকটে তাঁহার লোক থাক্‌বে, তা হলে আমার ভয় কি। কিন্তু তারা যদি না এসে থাকে।"

এই সময়ে কে তাহার নিকটস্থ হইল। প্যাটি চমকিত হইয়া দুরুদুরুবক্ষে সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক নিকটে আসিয়া বলিল, "প্যাটি।"

প্যাটি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, "মিষ্টার হারিঙ্গে ?"

হারিঙ্গে বলিল, "তুমি আমাকে এখানে দেখিতে আশা কর নাই, কেমন ?"

প্যাটি বলিল, "হাঁ আমি আপনাকে দেখে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি।"

হারিঙ্গে বলিল, "তোমার কি ভয় কর্‌ছে ?"

প্যাটি। না, ভয় কেন কর্‌বে ?

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন তাহার সাহস বিলুপ্ত হইয়াছিল। হারিঙ্গে আদরে তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলিল, "আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এসেছি; পত্রে কি আমি সে কথা তোমাকে লিখি নাই ?"

প্যাটি হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হাঁ, আপনি মেলফোর্ডের বিষয় বলুন।"

হারিঙ্গে এই কথায় মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল; কিন্তু মনের ভাব লুকাইয়া বলিল, "তুমি যদি মেলফোর্ডকে বাঁচাতে চাও, তবে আমার সঙ্গে এস। এখন কেবল আমিই তাকে রক্ষা কর্‌তে পারি। কিন্তু তোমায় বিবাহ কর্‌বার জন্য আমি তাকে রক্ষা কর্‌তে পারি না। আমি তোমার জন্য পাগল, তা কি তুমি জান না, প্যাটি ? কেন এখানে থেকে কষ্ট পাও, এস, আমার সঙ্গে রাজরাণীর মত সুখে থাক্‌বে।"

প্যাটি সবলে নিজ হাত ছাড়াইয়া লইয়া সক্রোধে বলিল, "না—না—না—আমি তোমাকে চুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তোমার সঙ্গে আমি কিছুতেই যাব না।"

হারিঙ্গে বিকট হাস্যে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "এখন আমার সঙ্গে না গিয়ে তোমার উপায় নাই। এত রাত্রে এই নির্জ্জন স্থানে তুমি আমার কাছে এসেছ, এখন তুমি আমার সঙ্গে না গেলে লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? তুমি আমার হাতে পড়েছ, আর পালাবার উপায় নাই, কাছেই গাড়ী প্রস্তুত আছে।"

এই বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে হারিঙ্গে প্যাটিকে নিজের বুকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া গাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিল। প্যাটি চীৎকার করিয়া উঠিল, তখনই একটা বৃহৎ লাঠী লইয়া গ্যাবেট সাহেব সেইদিকে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার ভৃত্যদ্বয়ও সেইদিকে ছুটিল।

কিন্তু সেই সময়ে হারিঙ্গে প্যাটিকে লইয়া লাফাইতে গিয়া সম্মুখস্থ একটা প্রকাণ্ড নর্দ্দমায় পড়িয়া গেল। প্যাটি ও হারিঙ্গে উভয়েই প্রচণ্ড আঘাত পাইল।

তখন হারিঙ্গে নিরুপায় হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে, মূর্চ্ছিতা প্যাটিকে রাখিয়া প্রবলবেগে গ্যাবেটের একজন ভৃত্যকে আক্রমণ করিল, এবং সুকৌশলে তাহাকে গভীর নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিল।

তখন হারিঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া আবার প্যাটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ীর নিকটে আসিল। গাড়ীর দরজার নিকটে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে বলিল, "শীঘ্র দরজা খোল।"

সে শীঘ্র গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল।

হারিঙ্গে প্যাটিকে গাড়ীতে তুলিয়া বলিল, "প্রাণপণে হাঁকাও।"

এই বলিয়া হারিঙ্গে নিজেও গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল—কিন্তু সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে তাহার গলা ধরিল; এবং সেই মুহূর্ত্তে হারিঙ্গের মুখের উপর পিস্তল লক্ষ্য করিল; সে বলিল, "তোমার লীলাখেলা ফুরিয়েছে—কোনও গোল করো না।" তাহার পর হাসিয়া বলিল, "তোমার সেই লোক, যার স্থলে আমি অনুগ্রহ করে তোমার কোচ্‌ম্যান হয়েছিলাম, সে ভাল জায়গাই আছে। কোন ভয় নাই, মহারাণীর আতিথ্য অনেক-দিন তাকে ভোগ কর্‌তে হবে। এখন মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে হাত দুখানি তুলুন—লোহার বালা পরুন, গোল কর্‌লেই এই দেখেছেন ত—গুলিভরা পিস্তল।"

হারিঙ্গে দেখিল, গোল করিলে তাহার মাথাটা এখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে। এ প্রকৃতির লোকেরা স্বভাবতই কাপুরুষ হয়, বিনা বাক্যব্যয়ে হারিঙ্গে সুবোধ বালকের ন্যায় হাত তুলিল। তখন সেই ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে পিস্তলের লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া বাম হস্তে পকেট হইতে হাতকড়ী বাহির করিয়া লাগাইল।

তখন হারিঙ্গে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বিকট শব্দ করিয়া কহিল, "রাস্কেল, তুমি কে—আমি জান্‌তে চাই।"

সেই ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "মহাশয়দের মত লোকের আমি দাসানুদাস—আমি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর বার্কস্‌—মহাশয়ের নিমন্ত্রণ আছে, তাই রাজপ্রাসাদে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

হারিঙ্গে গর্জ্জিয়া বার্কসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু এই সময়ে গ্যাবেট ও তাহার দুই জন সঙ্গী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; সুতরাং হারিঙ্গে বুঝিল, গোলযোগ করিলে

প্রহার ও লাঞ্ছনা ব্যতীত তাহার ভাগ্যে আর অন্য কিছুই নাই। সে বলিল, "চল, ভয় নাই—পালাব না।"

বার্কস্ হাসিয়া বলিলেন, "সে উপায় আর কই? তাহার পর গ্যাবেটের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই বালিকা মূর্চ্ছিতা হয়েছে, আপনি একে এই গাড়ীতে এর বাড়ী নিয়ে যান, আমরা এই মহাত্মাকে যথাস্থানে পৌঁছিয়া দিই।"

সেইরূপই হইল। গ্যাবেট সাহেব গাড়ী হাঁকাইয়া প্যাটিকে বাড়ী লইয়া গেলেন। বার্কস্ গ্যাবেটের দুই সঙ্গীর সাহায্যে হারিঙ্গেকে থানার দিকে লইয়া চলিলেন।

৫

বলা বাহুল্য মেলফোর্ড অনতিবিলম্বে খালাস পাইলেন।

হারিঙ্গের সঙ্গী প্রথমেই ধরা পড়িয়াছিল। সে দেখিল, সকল স্বীকার করিলে সে মহারাণীর সাক্ষীরূপে গণ্য হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া যাইতে পারে। তাহাই সে সকল কথাই প্রকাশ করিয়া দিল।

তাহার নিকটেই পুলিস সংবাদ পাইয়াছিল যে, হারিঙ্গে ও আরও সাত-আট জন অ্যানার্কিষ্ট ইংলণ্ডের বড় বড় বাড়ী, গির্জ্জা, ষ্টেশন প্রভৃতি ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিল—তাহারা সর্ব্বদাই এই চেষ্টায় ফিরিতেছিল।

কিরূপে হারিঙ্গে মেলফোর্ডকে দিয়া ডিনামাইটের পুলিন্দা আনাইয়াছিল—কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া সে মেলফোর্ডকে সরাইয়া প্যাটিকে পাইবার চেষ্টায় ছিল, পুলিস সকলই জানিতে পারিয়াছিল।

মেলফোর্ড জেল হইতে বাহির হইয়াই সর্ব্বাগ্রে প্যাটিকে দেখিতে ছুটিলেন, এত বিপদেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য প্যাটিকে ভুলিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রাণ প্যাটির কাছেই পড়িয়াছিল। এদিকে প্যাটিও সেইদিন রাত্রি হইতে পীড়িতা হইয়া শয্যায় পড়িয়াছিল—এখন মেলফোর্ডকে পাইয়া সে দুই-একদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিল।

প্যাটির সহিত দেখা করিয়া মেলফোর্ড উকীল গ্যাবেটের বাড়ী চলিলেন। দেখিলেন, গ্যাবেট সাহেব ইন্‌স্পেক্টর বার্কসের সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। দেখিয়া গ্যাবেট সাহেব বলিলেন, "মেলফোর্ড বসো, তুমি জান না, বোধ হয়, যে তুমি মিষ্টার বার্কসের নিকটে কত উপকৃত।"

মেলফোর্ড বলিলেন, "কিন্তু মিষ্টার বার্কস্ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।"

বার্কস হাসিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন না যে, দুই বেটার চোখে ধুলো দেওয়ার কত দরকার হয়েছিল। বেটারা জেনেছিল, যে, আপনার দফা রফা হয়ে গেছে—তাই সাবধান হয় নাই; নতুবা এদের ধরা সহজ হতো না।"

গ্যাবেট বলিলেন, "কি রকম করে কি হলো সব বলুন না, মিষ্টার বার্কস্? আমরা শোনবার জন্য ভারি ব্যগ্র হয়েছি।"

বার্কস বলিলেন, "আচ্ছা, তবে সংক্ষেপেই বলি। (মেলফোর্ডের প্রতি) যেদিন আপনার সঙ্গে আমার চেরিংক্রস ষ্টেশনে দেখা হয়, সেদিন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আমি আমার স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি—সে কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমার আদৌ স্ত্রী নাই। আমরা শুনেছিলাম, আমেরিকা থেকে অন-

কতক অ্যানার্কিষ্ট আমাদের রেল ষ্টেশন উড়িয়ে দিতে এসেছে, আমি ও আমার একজন বন্ধুর উপর চেরিংক্রস ষ্টেশনের উপর নজর রাখ্‌বার ভার পড়ে, তাই আমরা দুজনে সেখানে ঘুরছিলাম। আপনাকে যে ব্যক্তি পুলিন্দাটা দেয়, আমার সঙ্গী প্রথমেই তার উপর নজর রেখেছিল। সে যে আপনাকে একটা পুলিন্দা দিল, তাহাও আমরা দেখিলাম। আপনাকে আমি চিন্‌তাম, তাই সেই লোকটারই অনুসরণ করিলাম। সে ওয়াটারলু রোডের একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ কেউ সে বাড়ী থেকে বেরুল না। তার পর চশমা চোখে এক বুড়ো বেরিয়ে এল। আমরা যার পেছনে ছিলাম, সে গোঁফদাড়ীওয়ালা যুবক। আমার সঙ্গী বলিল, 'এ সে নয়—এ বুড়ো।' কিন্তু এই বুড়ো একটু এগিয়ে গিয়ে এমনই জোরে চলতে লাগ্‌ল যে, আমি বল্‌লেম, 'বুড়ো এর বাবা—এই সে লোক।' আমরা তিন মিনিটে গিয়া তাকে ধর্‌লেম। সে পলাইবার জন্য এমনই জোর কর্‌তে লাগ্‌লে যে, আমরা অতি কষ্টে তার হাতে লোহার বালা পরালেম। দেখি, তার সঙ্গে একটা ব্যাগ, ব্যাগে সেই দাড়ী গোঁফ।"

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর বার্কস্ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। গ্যারেট বলিলেন, "তার পর ?"

বার্কস বলিলেন, "তখন সে বেটা অন্য উপায় না দেখে আমাদের সব কথা খুলে বল্‌লে। হ্যারিঙ্গে প্যাটিকে ষড়যন্ত্র করে নিয়ে যাবার যে বন্দোবস্ত করেছে, তাও বললে। তখন আমি

ডানমিনিষ্টারে এসে তার পরিবর্ত্তে নিজে কোচ্ম্যান হলেম—তার পর যা হয়েছে, জানেন।"

গ্যাবেট বলিলেন, "এবার হ্যারিসের বাঁচ্বার কোন উপায় নাই।"

বার্কস বলিলেন, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।"

* * * *

কিছুদিন পরেই ব্লাণ্ট কোম্পানী, মেলফোর্ডের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সুতরাং শীঘ্রই প্যাটির সহিত মেলফোর্ডের বিবাহ হইয়া গেল।

আর সেই ভিখারীটা, তিনিই ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর বার্কস, তিনি আগে হইতেই হ্যারিসের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ

রাণী দুর্গাবতী

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

উপক্রম

আলোকমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী

রজনী কাল। আকাশে চাঁদ নাই, অসংখ্য নক্ষত্র আছে। সেই অন্ধকারে সম্মুখস্থ বহুদূরব্যাপী অরণ্য অতি ভয়ানক দেখাইতেছিল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। আকাশের পশ্চিমে এখন জলবর্ষী মেঘদল সরিয়া গিয়াছে। আকাশের তিন দিকে তারাদীপ্তি, কেবল একদিকে লঘু জলদ-বক্ষে, অন্তরালবর্ত্তী চন্দ্রের ক্ষীণ কররেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপদল সলিলবর্ষণে সঞ্জীবিত হইয়া, পবন-তাড়নে অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি করিতেছিল। পত্রাশ্রয়চ্যুত জলকণা শাখান্দোলনে ঝরিয়া ঝরিয়া সশব্দে ভূতলে পড়িতেছিল।

কিছুদূরে একটি উচ্চ পর্ব্বত। ধারাবর্ষণে গিরিকক্ষে বিশুষ্কা নির্ঝরিণী জলপূর্ণা ও উপলাহতা হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। আগেই বলিয়াছি, আকাশে চাঁদ নাই, তারা আছে, পৃথিবীতে আলো নাই, অন্ধকার আছে। সেই অতি নিবিড় অন্ধকারে, ততোধিক নিবিড় আরণ্যপ্রদেশে এই সকল ধ্বনি, পথিকের প্রাণে ত্রাস জন্মাইতেছিল।

তিনজন পথিক গড়মান্দলে যাইতেছিল। ঝড়-বৃষ্টিতে পথ হারাইয়া, পথিকত্রয় এই ভীষণ অরণ্যের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। দিনেও এ অরণ্যে মানুষ আসে না—দুর্য্যোগময়ী রজনীতে ত দূরের কথা। পথিকেরা প্রাণের আশা ছাড়িয়াছিল।

পরস্পরের হাত ধরিয়া পথিকেরা অতি সাবধানে পথ খুঁজিতেছিল। অনেক খুঁজিয়া অনেক হাঁটিয়া, অবশেষে শ্রমক্লান্ত, ভীত ও নিরাশ হইয়া পথিকত্রয় একটি বৃহৎ বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া পড়িল। আশা, চাঁদ উঠিলে বা রাত্রি পোহাইলে পথ খুঁজিয়া লইবে।

চারিদিক্ নিস্তব্ধ। পথিকেরাও ভীত ও নীরব। এইরূপে কিছুক্ষণ গেল।

হঠাৎ একে অপরের হস্ত পেষণ করিল। অপর ব্যক্তি বুঝিল, তাহার সঙ্গীর হৃদয়ে কিছু ভয়োদ্রেক হইয়াছে। ভয়, প্রায়ই সংক্রামক। বিশেষ, এমন সময়ে, এমন স্থানে। অপর ব্যক্তিও রোমাঞ্চিতকলেবরে, অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

প্রথম ব্যক্তি জড়িতস্বরে বলিল, "দেখ।"

"কি?"

প্রথম ব্যক্তি পর্ব্বতের দিকে কম্পিত হস্তে, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। সকলে সভয়ে দেখিল, গিরিশীর্ষে একটা অনৈসর্গিক আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়া এক বিশালদেহ পুরুষ যোড়করে, ঊর্দ্ধমুখে, আকাশের যে অংশে মেঘ, সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু ও ধবলশ্বেত বসনপ্রান্ত প্রবল পবনতাড়নে উড়িতেছে।

পুরুষের চক্ষে ধারা, অত্যুজ্জ্বল আলোকে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, যেন কাহার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতেছে। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছে, যেন কিছু বলিতেছে।

ধপ্ করিয়া গিরিশীর্ষ হইতে আলোক—দীপ্তি নিবিয়া গেল। ধীরে ধীরে পশ্চিম-অম্বরপ্রান্ত হইতে জলদজাল সরিয়া গেল। মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রকিরণে বিশাল বনভূমি হাসিয়া উঠিল।

পথিকত্রয় কম্পিতদেহে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়কম্পিত নেত্রে আর একবার পর্ব্বত শিখরের দিকে চাহিয়া দেখিল। ঘনঘটাচ্ছন্ন অম্বরবক্ষে বিজলীর ন্যায় সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। পথিকত্রয় একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর কার্ম্মুকমুক্ত শরের ন্যায় বেগে একদিকে পলায়ন করিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ের কিছু আগে, চিরবিখ্যাত পাণিপথ ক্ষেত্রে মোগল কর্ত্তৃক পাঠানরাজশক্তি সমূলে উন্মূলিত হইয়াছিল। একের বিসর্জ্জনে অপরের প্রতিষ্ঠা হইল। পাঠান গেল, মোগল আসিল। মোগল-সূর্য্য আকবর সাহ ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইলেন। হইয়া, একটি জাতিকে প্রায় বিনষ্ট করিলেন এবং আর একটি জাতিকে প্রায় পদানত করিয়া রাখিলেন। তাহারা পাঠান ও হিন্দু।

হিন্দুদের অনেকে মোগলের পদানত হইল বটে, কিন্তু সকলে হইল না। যাহারা হইল না, তাহাদের মধ্যে প্রতাপ-সিংহ ও গড়মান্দলের বিধবা রাণী দুর্গাবতীর নামই উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রতাপসিংহকে আমাদের আবশ্যক নাই, কিন্তু দুর্গাবতীকে লইয়া আমাদের প্রয়োজন আছে। দলপৎ রাও কিছুদিন গড়মান্দল শাসন করিয়া অনন্ত পথের যাত্রী হইলেন। দুর্গাবতী দলপৎ রাওএর আদরিণী মহিষী। পুত্র বীরনারায়ণ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। তাহার মুখ চাহিয়া দুর্গাবতী স্বামীর সহগমন করিতে পারিলেন না। দুর্গাবতী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

দুর্গাবতীর স্বর্ণস্মৃতি বক্ষে লইয়া ভারতেতিহাস আজ গৌরবান্বিত। একদিকে তিনি যেমন অপ্সরোলাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যবতী (১) ছিলেন, অপরদিকে তেমনি প্রখরবুদ্ধিশালিনী (২) ছিলেন।

---

(১) "was very beautiful." নিজামুদ্দীন।

(২) "celebrated for her ** good sense." ফেরিস্তা।

আর একদিকে তেমনি বীর্য্যবতী (৩) বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তিনি ক্রীড়া করিতেন, তীরধনু ও বন্দুক লইয়া এবং প্রজাশাসন করিতেন, সর্ব্বজীবে ভালবাসা লইয়া। (৪)

বীরনারায়ণ যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক—সেই সময়ে, করা ও মাণিকপুরের প্রতাপান্বিত নবাব—আকবর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া, বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে গড়মান্দল আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। দুর্গাবতী তাহাতে ভীতা হইলেন না। কারণ তিনিও সমরবিদ্যায় অনভিজ্ঞা ছিলেন না। ইতিঃপূর্ব্বে মালব-রাজের সহিত বহুযুদ্ধে তিনি বিজয় গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার একমাত্র চিন্তার কারণ, আসফ খাঁর অধীনে অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য, আর তাঁহার অধীনে মাত্র পঞ্চশত সৈন্য। কিন্তু সৈন্যবলের অল্পাধিক্যে দুর্গাবতী শঙ্কিতা হইলেন না। কারণ, বীর্য্য ও সাহসিকতাই রণজয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। যাহা হউক, দুর্গাবতীর অশেষ যত্নে, অবশেষে চারি সহস্র সৈন্য তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয়। সেই সৈন্যের এবং অধর(৫) কায়স্থ নামক জনৈক বুদ্ধিমান্ অমাত্য প্রদত্ত সুপরামর্শের সাহায্যে দুর্গাবতী আপনার নগণ্য বাহিনী লইয়া, প্রবল মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা হইলেন। ৯৭১ হিজরীতে(৭) এই সুপ্রসিদ্ধ সমর-যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

---

(৩) "She was highly reknowned for her courage, ability and liberality,** she had brought the countiy under her rule."—আবুল ফাজল।

(৪) "Remerkable for her beauty and loveliness." ফৈজী সারহিন্দ।

(৫) "A brave officer of household, by name Adhar."ফেরিস্তা।

(৬) "With the assistance of Adhar Kayeth."—আকবর নামা।

(৭) ফৈজী সারহিন্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমরোদ্যোগ

গড়মান্দল রাজ্য আজ লোকে লোকারণ্য। রাণী-মাতা আজ সকলকে মদন-মহলে আহ্বান করিয়াছেন, তাই রাজ্য ভাঙিয়া দলে দলে লোক ছুটিয়াছে।

তখন প্রভাত কাল। নর্ম্মদার প্রবহমান অনাবিল স্রোতের উপরে উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া তরঙ্গভঙ্গে নাচিতেছে, জলিতেছে। নর্ম্মদার স্রোত দুকূল বাহিয়া কুলু কুলু নিনাদে ছুটিয়াছে, তীরদেশে অসংখ্য জনস্রোত কলশব্দ করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

মদন-মহল প্রাসাদ একটি পর্ব্বতোপরি স্থাপিত, একখানিমাত্র বিস্তৃত প্রস্তরের উপরে এই সুন্দর প্রাসাদটি অসীম শিল্পকুশলতার সহিত স্থাপিত। এই প্রাসাদে রাণী গ্রীষ্মকাল যাপন করিতেন। একটি মহলে, আবশ্যক হইলে দরবার বসিত, অন্য মহলে তিনি বাস করিতেন। (৮)

জনস্রোত মদন-মহলে আসিয়া থামিল।

---

(৮) এখনও এই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে, যাঁহারা মধ্য-প্রদেশের জব্বলপুর সহরে বেড়াইতে যাইবেন, তাঁহারা যেন এই অতীত কীর্ত্তি-স্তম্ভটি দেখিতে ভুলিয়া না যান। পথের উপরে 'মদন-মহল' পাহাড়ের উপরে সুন্দর প্রাসাদটি স্থাপিত। মদনগোপাল নামক রাজা এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এখন ইহা হিংস্রপশুভীতিপূর্ণ হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা বাঘ ভালুকের হস্তে আত্মারামের পিঞ্জরমুক্ত হওয়ার ভয় করিবেন, তাঁহারা না যাইলে চলিবে।

মদন-মহলের দরবার-কক্ষ আজ সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছে। স্তম্ভে স্তম্ভে কুসুমিতলতা বিজড়িত। কক্ষতলে মূল্যবান্ আস্তরণ প্রসারিত। একস্থানে মহার্ঘ রত্নরাজিখচিত সিংহাসন। দুই পাশে দুই মহামূল্য বসনপরিহিতা সুন্দরী যুবতী কুমারী চামর হস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সিংহাসন পার্শ্বে রাণী দুর্গাবতী ইন্দ্রাণীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দুর্গাবতী রাণী হইলেও রাজ-তপস্বিনীর মতন বিলাস ও সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। পতির স্বর্গারোহণ অবধি, নিজে একদিনের জন্যও সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। কেবল রাজমহিমা প্রকাশার্থ এবং চিরাচরিত নিয়ম রক্ষার্থ তিনি রাজঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক বিধিগুলি পালন করিতেন, কিন্তু নিজে সম্পূর্ণভাবে তাহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিতেন।

রাণীর মস্তকের চিক্কণকৃষ্ণ কেশরাশি, তিমির-তরঙ্গের ন্যায় পৃষ্ঠে, স্কন্ধে এলায়িত। শিরে মুকুট নাই, তাহা সিংহাসনের উপরে স্থাপিত। পরিধানে মূল্যবান্ শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র।

তাঁহার নয়নদ্বয় তেজোদীপ্ত ও বিপুলায়ত, নাসিকা দীর্ঘ, ললাট প্রশস্ত। উন্নত বক্ষের নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি রক্ষিত। রাণীর মত রূপবতী তখন খুব অল্পই দেখা যাইত। রূপ—শুধু সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য সর্ব্বত্র প্রশংসিত নয়। রূপ—তখনই প্রশংসনীয়—যখন তাহার সহিত পুণ্য ও পবিত্রতা মিশ্রিত হয়। দুর্গাবতীর তাহা ছিল। ইহার সহিত বীর্য্যবত্তা মিশিয়া তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশসাধন করিয়াছিল।

সে সৌন্দর্য্য কামিতাপূর্ণ নয়। সে পূত সৌন্দর্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইলে কামভাব দূরে পলায়। অঞ্জলী আপনি বদ্ধ হয় ও মস্তক

আপনিই নত হয়। এবং সে সৌন্দর্য্য দেখিলে অন্য কিছু মনে পড়িবে না, কেবল বোধ হইবে, আমার সম্মুখে আপনি বিশ্বমাতা শ্রীশ্রীশ্বরীদুর্গা দেবী আসিয়া সহাস্য আননে দাঁড়াইয়া আছেন।

দুর্গাবতীর অপরপার্শ্বে পুত্র বীরনারায়ণ যোদ্ধৃবেশে দণ্ডায়মান। বীরনারায়ণ অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক, দেখিতে পরম সুন্দর বিশাল দেহ, কবাটবক্ষ, উন্নতস্কন্ধ, সিংহগ্রীব। কক্ষালে পিধান মধ্যে করবাল, হস্তে বল্লম, পৃষ্ঠে তূণীর, স্কন্ধে কার্ম্মুক, অঙ্গে বর্ম শিরে শিরস্ত্রাণ, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক। আর একদিকে প্রৌঢ়বয়স্ক অধর। মুখমণ্ডল দেখিলেই তাঁহাকে দয়ালু বলিয়া জানা যায়

দরবারের একদিকে সশস্ত্র সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান। বালারুণ রশ্মি তাঁহাদের অস্ত্রোপরি প্রতিফলিত হইয়া জ্বলিতেছে। সৈন্যগণের সম্মুখে চারণগণ, বাদ্যযন্ত্রাদি হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন।

জনসাধারণ রাণীমাতার নামে উচ্চ জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন সেই সুবৃহৎ দরবার কক্ষে যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইদিকেই দেখিবে, কেবল নরমুণ্ড বিরাজিত।

রাণী সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে বিপদের কথা বুঝাইয়া দিলেন এবং নানারূপে তাঁহাদের হৃদয়ে সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া সকলকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিলেন। সৈন্যগণ সমকণ্ঠে উচ্চস্বরে বারংবার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

দুর্গাবতী যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে কক্ষতলে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "হে প্রভু! হে বিশ্বদেব! আমি অবলা নারী; আজ মহাসাগর সাঁতরাইয়া পার হইবার আশায় ঝাঁপ দিলাম। এ বিপদে তুমিই আমার অকূলকাণ্ডারী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রমোদে প্রমাদ

নর্ম্মদা তট। মোগল-শিবির। শিবিরাভ্যন্তরে তিন ব্যক্তি বসিয়া কথা কহিতেছিলেন।

প্রথম, আসফ খাঁ—আকবর নিয়োজিত প্রধান সেনাপতি। অপর দুই ব্যক্তি তাঁহার সহকারী সেনাপতি। প্রথম স্পষ্টবক্তা, রহস্যপ্রিয় মুরাদ-আলি—আসফের বাল্যবন্ধু ও আপাততঃ সহকারী। দ্বিতীয়, নেয়ামত-আলি।

আসফ খাঁ বলিতেছিলেন, "তাহা হইলে, নেয়ামত! আজই রাত্রে গড়মান্দল আক্রমণ করা যাক ?"

নেয়ামত কহিলেন, "অবশ্য—অবশ্য।"

মুরাদ কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, আসফ খাঁ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মুরাদ! ব্যাপার কি ? তুমি যে নেহাৎ ভালমানুষের মত চুপ করিয়া রহিলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ—"

"আজ্ঞে হাঁ—কি রকম ?"

"আজ্ঞে—ঐ রকম।"

"ঐ রকম কি ?"

"বন্ধুবর নেয়ামত যে রকম ভাবে 'অবশ্য অবশ্য' বলিলেন, আমিও সেইরকম ভাবে, না ভাবিয়া, না চিন্তিয়া 'আজ্ঞে হাঁ'টা বলিয়া ফেলিলাম। ওটা বলিতে বিশেষ কোন দায়িত্বের দরকার নাই, বোধ হয়।"

আসফ খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তুমি কি আজ গড়মান্দল আক্রমণ করিতে নিষেধ কর? তাতে তোমার আপত্তি আছে?"

"বিশেষ আপত্তি।"

"কেন?"

"দুর্গাবতীকে সামান্যা রমণী ভাবিয়া তাচ্ছিল্য করিবেন না। তা যদি করেন, তা'হ'লে রণজয়ের আশা দূরে থাকুক, মাঝে থেকে আমরাই দরিয়ায় নাকানি চোবানি খাব। আমার বিবেচনায় আরও কিছু সৈন্য আসুক, তারপর আমরা একযোগে গড়মান্দল আক্রমণ করিব।"

আসফ খাঁ বলিলেন, "ছিঃ মুরাদ! তুমি বড় কাপুরুষ, একটা নারীকে এত ভয়—যে নারীকে নিয়ে আমরা পুতুলখেলা করি?"

মুরাদ বলিলেন, "দুর্গাবতী নামে নারী, কাজে নয়। আর আমাকে কাপুরুষ যদি বলিতে চান বলুন—আপত্তি করিব না। তবে শুনিয়াছি, হিন্দু সন্ন্যাসীরা বলে, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু," অর্থাৎ আপনার মত সকলকে দেখ, তাহা হইলেই তোমার মুক্তি হইবে। আপনি বোধ করি, সেই দুষ্প্রাপ্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাই আমাকে কাপুরুষ বলিলেন।"

আসফ খাঁ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বেশ মুরাদ! খুব জবাব দিয়াছ; কিন্তু, এখন কি করা উচিত বল দেখি।"

মুরাদ বলিলেন, "আগামী তিন দিনের কাজের তালিকা আমি দিতেছি। ভোরবেলা উঠিয়া প্রথম কাজ বায়ুভক্ষণ, দ্বিতীয় কাজ, পোলাও কালিয়া প্রভৃতি জঠরগহ্বরে প্রেরণ, তৃতীয় কাজ নাসিকায় সর্ষপ তৈল মর্দ্দন এবং গভীর নিদ্রায় মগন, সায়াহ্নকালে

উত্থান, এবং নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও গীত দর্শন ও শ্রবণ ; তৎপরে সরাপ এবং পুনরায় পোলাও কোর্ম্মা, কালিয়া হালুয়া——"

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্ !

বাহিরে কাহার তোপ চতুর্দ্দিক্ কম্পিত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মুরাদ একলম্ফে আসন ত্যাগ করিলেন, এবং বলিলেন, "জাঁহাপনা! রাজপুতেরা আর আপনাকে হালুয়া ভোজনের অবসর দিল না, ঐ শুনুন! ঐ—ঐ—বাপ্!" মুরাদ একলম্ফে সরিয়া দাঁড়াইলেন, ধূ—ধূ—করিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ পটমণ্ডপ জ্বলিয়া উঠিল। কানাতে লেলিহান অগ্নিশিখা নাচিতে লাগিল।

আসফ খাঁ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন। এতক্ষণে তাঁহার চেতনা হইল। তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বাহিরে তখন ভীষণ কোলাহল উঠিয়াছে। রাজপুত-সৈন্যেরা ভীষণ জয়নাদ করিতেছিল, মোগলেরা ব্যাধবিতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিতেছিল। আহতের আর্ত্তরব, বিজয়ীর হুঙ্কার, কামান ও বন্দুকের মিশ্রিত ভৈরবনিনাদে কর্ণ বধিরপ্রায় করিয়া তুলিতেছিল।

আসফ খাঁ হাঁকিলেন, "প্রহরি!"

মুরাদ কহিলেন, "ক্ষান্ত হোন্ জনাব! বাহিরে যেরূপ উৎকট সঙ্গীতালাপ আরম্ভ হইয়াছে, তাতে আপনার মিহিসুরের সৌখীন ডাক্ প্রহরীর কর্ণে প্রবিষ্ট হবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।"

আসফ খাঁ ফিরিয়া ডাকিলেন, "নেয়ামত!"

"আজ্ঞে, সে ভদ্রলোকের মত সোজাপথে প্রস্থান করিয়াছে।"

"মুরাদ!"

"বলুন।"

"নেয়ামতটা কি কাপুরুষ ?"

মুরাদ বলিলেন, "সে বিবেচনার অবসর এখন নাই। অনুগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিয়া এখন ভুল শোধরাইবার চেষ্টা করিবেন চলুন। আর যদি ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে চান—বলুন ঘোড়া আনি। তারপর রাজপুতদের দিকে পিছন ফিরিয়া——"

বাধা দিয়া আসফ খাঁ বলিলেন, "মুরাদ! মুরাদ! আমার মান সম্ভ্রম সকলি গেল। চল, চল।"

মুরাদ বলিলেন, "যা গেছে, তার জন্য গতস্য শোচনা নাস্তি, তবে প্রাণটা এখনও আছে, নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে। এখনি এ বেচারার একটা উপায় করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছে।"

অনন্তর উভয়ে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেমালাপে বিপ্লব

আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। পৃথিবীতে সরোবরবক্ষে কুমুদিনী হাসিতেছে। আকাশে ছায়াপথ, পথের চারিদিকে তারকা জ্বলিয়া পথ দেখাইয়া দিতেছে। ছায়াপথ দিয়া, দেবগণ কি যাওয়া-আসা করেন ? বসুধায় পথের ধারে মনুষ্যপ্রজ্বলিত দীপাবলী জ্বলিতেছে; নর্মদার চঞ্চল বক্ষে দীপালি জ্বালা কাঁপিতেছে অথবা রাজপুতের বিজয়গৌরবে উল্লসিত হইয়া নাচিতেছে।

নর্ম্মদা-তটে একটি সুন্দর উদ্যান। উদ্যানে নানা ফুলের গাছ, সেই নানা ফুলের গাছে নানা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে পুষ্পিতালতিকাবেষ্টিত বিনোদকুঞ্জ। কুঞ্জের ধারে ধারে শ্বেতপ্রস্তর গঠিত বেদিকা। একটী বেদিকার উপরে বসিয়া, একটি পরমরূপসী তন্বী ললনা। যুবতী আপন মনে বসিয়া গান গাইতেছিলেন। হৃদয়ের ভিতরে তখন আমাদের চিরপরিচিত কুসুমায়ুধ ঠাকুরটী বিরহের খেলা বাধাইয়া দিয়াছিলেন কি না, জানি না। স্ত্রী-হৃদয় দুর্জ্ঞেয়, আমি কি করিয়া জানিব বল? তবে যুবতী যে গানটি গাইতেছিলেন, তাহা বলিতেছি। যুবতী গাইতেছিল;—

গীত

আকাশে সোনার চাঁদের খেলা
তারকারাজি জলিছে।
আমার পরাণ, কাঁপিছে সুখে
প্রিয় ঐ বুঝি আসিছে।
ওই তটিনী বহিয়ে যায়,
ওই কোকিল সুগীত গায়,
এই হৃদয়ে সে সুখ ভায়,
প্রিয় ঐ বুঝি আসিছে।
হোথা মধুরকুসুমপুঞ্জ রে,
হোথা মোহনবিপিনকুঞ্জ রে,
হেথা পাদপ-লতিকা গুঞ্জরে,
প্রিয় ঐ বুঝি আসিছে।
ও মুখ দরশ, ও কর পরশ
করিতে—প্রাণ তাই নাচিছে।
তুহারি চরণ, এ হৃদি-শরণ,
আমার মরণ-জীবন-যৌবন-ধন
সকল শরণ আসিছে।

"বড় আনন্দ যে পদ্মিনি! তোমার 'মরণ-জীবন-যৌবন-ধন' কে, আমাকে বলিবে না?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে কুমার বীরনারায়ণ আসিয়া লাজনতা পদ্মিনীর পাশে, বেদীর উপরে বসিয়া পড়িলেন।

পদ্মিনী বীরগড়ের রাজকন্যা। বীরনারায়ণের সহিত বিবাহার্থ গড়মান্দলে আনীত হইয়াছিলেন (৯)। উপস্থিত বিপদের জন্য আজও শুভকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। পদ্মিনী বীরনারায়ণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া, নরকরস্পর্শ-সঙ্কুচিতা লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় অঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন। বীরনারায়ণ সপ্রেমে পদ্মিনীর ব্রীড়ারক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, তাঁহার ফুল্লগণ্ডে একটি চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, "বলিবে না? তবে আমি যাই," বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পদ্মিনী বড় বড় ডাগর চোখে বীরনারায়ণের মুখের দিকে চাহিলেন। হাসিয়া বীরনারায়ণ আবার বসিয়া পড়িলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিবে না?"

পদ্মিনী সে কথা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "কুমার! এই কয়দিন ত আমাকে একবার দয়া করিয়া স্মরণও কর নাই, যুদ্ধের কি হইল?"

যুদ্ধের নামে বীরনারায়ণ সকল কথা ভুলিয়া গেলেন। উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আশ্চর্য্য! তুমি এখনও শুন নাই?"

পদ্মিনী সকলই শুনিয়াছেন। কিন্তু 'শুনিয়াছি' বলিলে, কুমার এখনই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। ছিঃ! সে কথার

(৯) বৈবাহিক সার ছিল।

উঠিল্ কি মুখের উপরে দেওয়া যায় ? অতএব পদ্মিনী বলিলেন, "তোমার মুখে ত শুনি নাই।"

বীরনারায়ণ বলিলেন, "প্রথম দিন আমরা হঠাৎ মোগলদের আক্রমণ করি। মোগলেরা সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া গেল। তারপর সেদিন আমরা ফিরিয়া আসিলাম। কাল রাত্রে মোগলেরা আমাদের অতর্কিত ভাবে সহসা আক্রমণ করেণ কিন্তু আমরা সতর্ক ছিলাম। যদিও মোগল-সৈন্য সংখ্যায় আমাদের অপেক্ষা চার-পাঁচ গুণ বেশী, তবু তারাই পরাজিত হইল। আজ সকালে মোগলেরা আবার আমাদের আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং মা, আর মন্ত্রিবর অধর আবার তাদের পরাজিত করিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছেন। মার ইচ্ছা ছিল, মোগলদের আরও দূরে তাড়াইয়া আসেন, কিন্তু প্রধান প্রধান সেনানীরা অমত করাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মার এই প্রত্যাগমনটা মনঃপূত হয় নাই। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ফিরিয়া আসাতে পরিণামে আমাদেরই অমঙ্গল হইবে।' এই ত ব্যাপার। এখন একটু অবসর পাইয়া তোমার ঐ চাঁদ মুখখানি দেখিতে ছুটিয়া আসিলাম। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া কোথাও তোমাকে দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে এই বাগানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখানে দেখি, এ মুখচন্দ্রখানি বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে।" বলিয়া বীরনারায়ণ পদ্মিনীর মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া প্রেমস্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "ছার তুমি আকাশের চাঁদ। তোমার আলো জগতের অন্ধকার দূর করে বটে, কিন্তু এই হৃদয় ত আলোকিত করে না। তুমি আকাশের চাঁদ। বাহির আলো কর, কিন্তু

ভিতর আলো করিতে পার না। এ পৃথিবীর সজীব চাঁদের কাছে, ছার তুমি আকাশের মূক নির্জ্জীব চাঁদ।"

"বীরনারায়ণ!"

উভয়ে চকিত হইয়া দুইদিকে সরিয়া গেলেন। তাহার পর বীরনারায়ণ অগ্রসর হইলেন।

"বীরনারায়ণ!"

"মা!"

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। মোগলেরা আমাদের আক্রমণ করিতে আসিতেছে।"

বীরনারায়ণ ভীতভাবে বলিলেন, "আবার?"

"আবার," বলিয়া রাণী দুর্গাবতী উদাসনেত্রে চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল নর্ম্মদার বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাণীর অপূর্ব্ব বেশ। পরিধানে, সুনির্ম্মিত লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত পরিচ্ছদ। ক্ষীণ কটিতে নরশোণিতপিপাসু পিধানবদ্ধ তরবারি; এক হস্তে শূল, অপর হস্তে ধনু—পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর। তাহার উপর সেই বিপুল তমিস্রনির্ঝরবৎ কেশদাম গুচ্ছে গুচ্ছে এলায়িত ভাবে পড়িয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্বা মহিয়সী প্রতিমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। মস্তকে শিরস্ত্রাণ। (১০)

বীরনারায়ণ বলিলেন, "তবে কি হবে মা?"

দুর্গাবতী সুপ্তোত্থিতার ন্যায় বীরনারায়ণের মুখের প্রতি চাহিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "কি

---

(১০) "Like a bold Heroine she led on her troops to action, clothed in armour, with a helmet upon her head." ফেরিস্তা।

হইবে? সাধের গড়মান্দলের পতন—আর কি? আর কি চাও বৎস? বিধিলিপি অখণ্ডনীয়!” বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় দুর্গাবতী করস্থ শূল আস্ফালন করিতে করিতে, বেগে প্রস্থান করিলেন।

“পদ্মিনি! প্রিয়তমে! শ্মশানেই আমাদের জন্য উত্তম বাসর শয্যা আস্তৃত হইবে—বিদায়!” বীরনারায়ণ উলঙ্গ অসি হস্তে মাতার অনুবর্ত্তী হইলেন।

সজলনয়নে পদ্মিনী বলিলেন, “প্রভু! দেবতা আমার! ইহলোকের স্বল্প বিরহ দূরে রহুক, পরলোকের অনন্তমিলন আমরা ভোগ করিব।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ ও বিসর্জ্জন

প্রলয়ের রুদ্র তাণ্ডব। কামান গর্জ্জন করিতেছে, বন্দুক হাঁকিতেছে, অশ্ব ছুটিতেছে, বিজয়ী সিংহনাদ করিতেছে, আহত আর্ত্তনাদ করিতেছে, মুমূর্ষু জল প্রার্থনা করিতেছে, জীবিত তাহাকে পদতলে দলিয়া ছুটিতেছে। ধ্বংসের উন্মত্ত নর্ত্তন!

একদিকে সহস্র সহস্র সংখ্যাহীন মোগল—বাহিনী অপর দিকে অঙ্গুলাগ্রে গণনীয় স্বল্প সংখ্যক রাজপুত সৈন্য। নদীর বন্যা দেশধ্বংসী বটে, কিন্তু সাগরে সেই বন্যা ক্ষুদ্র স্রোত মাত্র এক্ষেত্রে মোগল সাগর, আর রাজপুত নদীর সহিত তুলনীয় নদীর স্রোত সাগরের উর্দ্মিমালার সঙ্গে মিলাইয়া যাইবার মত হইল।

সহসা বিপক্ষপক্ষ হইতে একটি তীক্ষ্ণশর, অব্যর্থ কার্মুক-মুক্ত হইয়া ছুটিল—হস্তি-আরূঢ়া রাণী দুর্গাবতীর একটি কমল নয়ন বিদ্ধ করিল। (১১)

অমাত্যবর অধর স্বয়ং আজ করিবরের চালনাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাতরে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মা, মা, মা!"

দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত করিয়া, অপর নয়নে প্রজ্বলিতশিখা বর্ষণ করিয়া রাণী বলিলেন, "চালাও হস্তী—অমাত্যবর! একমাত্র চক্ষুর জন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইবার কোন কারণ নাই—এখনও অন্ধ হই নাই, যতক্ষণ আমার দেহের ধমনীতে ধমনীতে শোণিতের বিরাম নাই—ততক্ষণ এ যুদ্ধেরও বিরাম নাই—" রাণী স্বহস্তে বিদ্ধচক্ষু হইতে শরাগ্রভাগ টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাহা উঠিল না, প্রবল আকর্ষণে তাহা ভাঙিয়া গেল, অগ্রভাগ চক্ষুর ভিতরেই বিদ্ধ রহিয়া গেল।

অধর হস্তী চালাইলেন। রাণীর করনিক্ষিপ্ত শূলে একজন অশ্বারোহী আহত হইয়া ভূতল চুম্বন করিল, কার্মুকমুক্ত শরজালে চারিদিকে, ঝড়ের আগে কদলী বৃক্ষের মত মোগল পড়িতে থাকিল। রাণীর তরবারি প্রহারে কত মোগল ছিন্নকণ্ঠ হইয়া ভূতলশায়ী হইল। স্বয়ং আদ্যাশক্তি আজ যেন অসুর নিধনার্থ সমরে অবতরণ করিয়াছেন।

কিন্তু বৃথা! দুর্গাবতী অপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রাণ-প্রতিম পুত্র বীরনারায়ণ অসংখ্য মোগল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া,

(১১) ফেরিস্তা।

আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। "হা বিধি! শুধু গড়মাণ্ডলের প্রতি তোমার এ কি রোষ!" বলিয়া অধর হস্তী ফিরাইতে উদ্যত হইলেন।

'শান্ত হও অধর!' ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় রাণী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সবই গেল, আমিও যাইব। এমন মরণ হইতে তুমি আমাকে ফিরাইতে চাও? এইখানেই এ ছার প্রাণের উপরে মহাকালের যবনিকা পড়িয়া যাউক।"

দুর্গাবতী কটিলম্বিত ক্ষুদ্র অসি বক্ষের উপরে উদ্যত করিলেন।

অধর ব্যগ্র হইয়া কহিল, "মা, মা, অমন কাজ করিবেন না—আঁপনি থাকিলে কিসের অভাব! আত্মহত্যা করিবেন না।"

দুর্গাবতীর এক নয়ন দিয়া তখন অজস্রধারে শোণিত নির্গত হইতেছিল; অপর নয়ন রোষে জ্বলিয়া উঠিল। দুর্গাবতী বলিলেন, "অধর! আর কিছু করা অসম্ভব। আর কেন? আর দেখিতে পারি না, যাতে গড়মাণ্ডলকে বিধ্বস্ত দেখিতে না হয়, তার উপায় করি—ঐ দেখ অধর! সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। ঐ দেখ, মোগলসৈন্য সিঙ্গুরাগড়ের উচ্চপ্রাকারে কাতারে কাতারে আরোহণ করিতেছে। আর না! অসহ্য! অসহ্য!" বলিতে বলিতে বীর্য্যবতী, রাণী দুর্গাবতী, সেই উদ্যত অসিফলক সবলে নিজ হৃদয়ে আমূল আরোপিত করিলেন। পরমুহূর্ত্তে মরণাহতা হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন।

উপসংহার

রাণী দুর্গাবতী রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে পর, বীরনারায়ণ আর একবার মোগলের সহিত বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব যুদ্ধে তিনি আহত হইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু শেষ যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইলেন।

অধরের কি হইল, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু নিশীথ-রাত্রে—গড়মান্দলের পার্শ্বস্থ অরণ্য-প্রদেশে, অনেকে ভীতিপূর্ণ হৃদয়ে দেখিয়াছে, উচ্চপর্ব্বতের উপরে জ্যোতির্মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী এক পুরুষ সকাতরে ঊর্দ্ধমুখে অনন্তদেবের নিকটে কি প্রার্থনা করিতেছে। সে কি অধর না অধরের প্রেতাত্মা? প্রার্থনা করে কি? দুর্গাবতীর পরলোকে মঙ্গল কামনা না গড়মান্দলের কল্যাণ?

সমাপ্ত।

প্রণয়-প্রতিমা

(শিকারীর গল্প)

১

রাজপুতনার অন্তর্গত কোটা নগরের কিছুদূরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে সুদিন, তাহার স্ত্রী রায়মতী, তাহাদের এক বৎসরের একটি কন্যা লইয়া দুঃখে সুখে বাস করিত।

সুদিন জাতিতে দোষাদ ছিল—ব্যবসা করিত শিকারীর। প্রায়ই দিন কষ্টে যাইত—ভুট্টার রুটী ব্যতীত অধিক কিছু জুটিত না। প্রত্যহই সুদিন শিকারে বহির্গত হইত—নানাবিধ পাখী মারিয়া কোটার বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিত। যেদিন সে একটা হরিণ মারিতে পারিত, সেইদিনই তাহাদের আহারাদি ভাল হইত।

হরিণের মাংস কোটার বাজারে বেচিয়া সুদিন ভাল ভাল খাদ্যাদি ক্রয় করিয়া আনিত—কন্যার জন্যও দুই-একটা খেলনা বা একখানি ভাল রংএর কাপড় কিনিয়া ঘরে ফিরিত।

সুদিন যদিও অনেক নেকড়ে, চিতা প্রভৃতি বাঘ শিকার করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কখনও আসল বাঘ মারিতে পারে নাই। যদি নিকটস্থ বৃহৎ জঙ্গলের কোন অংশই তাহার অবিদিত ছিল না—তবুও তাহার অদৃষ্টক্রমে তাহার সম্মুখে কখনও কোন আসল বাঘ পড়ে নাই।

বাঘ মারিতে পারিলে সরকার হইতে টাকা পাওয়া যাইবে, ইহাও একটা প্রলোভন বটে; কিন্তু ইহাপেক্ষা বড় প্রলোভন সুদিনের পক্ষে একটা বড় বাঘ শিকার করা। শিকারী হইয়া জীবনে যদি একটা আসল বড় বাঘ মারিতে না পারিলাম, তবে করিলাম কি? সুদিনের ইহাই জীবনের উচ্চ আশা ছিল।

একদিন সুদিন কোটার বাজারে তাহার শিকারের দ্রব্যাদি বেচিয়া যাহা কিছু তাহার প্রয়োজন ছিল, সকল কিনিয়া গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে এক গাছতলায় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিল। ভয়ানক রৌদ্র। সে ভাবিল, একটু রোদ পড়িলে তবে গৃহাভিমুখে যাইবে।

সুদিন নিজের ক্ষুদ্র হুঁকাটি বাহির করিয়া, তামাক প্রস্তুত করিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছিল ও বাড়ীতে তাহার কন্যা এখন কেমন হাসিতেছে, খেলা করিতেছে, তাহাই ভাবিয়া মনে মনে সুখী হইতেছিল। সেখানে সেই গাছতলায় আরও কয়েকজন লোক যে তাহারই ন্যায় বিশ্রাম করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহা সে প্রথমে লক্ষ্য করে নাই।

এক্ষণে সহসা তাহাদের কথায় তাহার কান পড়িল। একজন বলিল, "তা হলে আবার সেটা দেখা দিয়াছে?"

আর একজন বলিল, "কেবল দেখা নয়, হারালপুরের রহিমবক্সকে খেয়েছে।"

আর একজন বলিল, "বড় সাহেব ঢেঁড়া দিয়েছেন, যে সেই বাঘটাকে মারতে পারবে, তাকে দুশো টাকা দেবেন।"

আর একজন বলিল, "এ কথা ঠিক্—ঢেঁড়া দেবার সময় আমি ছিলাম—কিন্তু কে যমের সুমুখে যাবে?"

সকলেই বলিয়া উঠিল, "তা ঠিক—তা ঠিক !"

একজন বলিল, "সে বাঘটা যে সব মানুষ খেয়েছে, এখন তারা দানো পেয়ে তারই ঘাড়ে চেপেছে—তাকে মারে কে ?"

আবার সকলে বলিল, "হাঁ—হাঁ তা'ত বটেই।"

সুদিন নীরবে ইহাদের কথা শুনিতেছিল। এক্ষণে সে আসিয়া ইহাদের কথোপকথনে যোগ দিল। সে ভাবিল, "এই এক সুবিধা—যদি আমি এই বাঘকে মারিতে পারি, তাহা হইলে দুইশত টাকা পাইব—আমাদের আর কোন দুঃখ থাকিবে না—তারপর আমার এত দিনের আশা মিটিবে, লোকেরও একটা বড় শত্রু দূর হইবে।"

বাঘ কোথায় দেখা গিয়াছিল, এখন সম্ভবতঃ কোথায় আছে, কত মানুষ খেয়েছে প্রভৃতি অনেক কথা সুদিন তাহাদের নিকট জানিয়া লইল—তৎপরে সে এই বাঘ শিকার করিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

সুদিন গৃহে ফিরিয়া অন্য দিনের ন্যায় আজ আর নিজের কন্যাকে আদর করিল না, রায়মতীর কথায়ও 'হাঁ' 'না' করিয়া উত্তর দিল। কি করিবে, কোথায় গিয়া কি উপায়ে বাঘ মারিবে, আজ তাহার মাথার ভিতর ইহা ভিন্ন আর কোন চিন্তা ছিল না।

২

পর দিবস সকাল হইতে-না-হইতে সুদিন তাহার তরবারি কটিদেশে বাঁধিয়া, ঢাল পিঠে ঝুলাইয়া এবং বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইল।

কিয়দ্দূর গিয়া সে একটা গ্রাম হইতে ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইল। নিকটে গিয়া দেখিল, গ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের একটা লোক গরু চরাইতে বাহির হইয়াছিল; সে গ্রামের পাশেই গরু চরাইতেছিল, কিন্তু সহসা সেই বাঘ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে—গ্রামের লোক আসিয়া না পড়িলে বাঘ নিশ্চয়ই তাহাকে লইয়া যাইত।

লোকের তাড়া পাইয়া বাঘ তাহাকে ফেলিয়া ধীরে ধীরে নিকটস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। লোকটি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে।

সুদিন তৎক্ষণাৎ যেখানে সেই লোকটিকে বাঘে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল, বাঘের পায়ের বড় বড় দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দাগগুলি বরাবর জঙ্গলের দিকে গিয়াছে।

সুদিন বিনাবাক্যব্যয়ে বাঘের পায়ের দাগ ধরিয়া জঙ্গলের দিকে চলিল। সে অবশেষে জঙ্গলের এক গভীরতম প্রদেশে আসিল। সেখানে চারিদিকে পাথর, পাহাড়, গহ্বর—কাঁটা-গাছে পূর্ণ—পাশেই একটি ছোট নদী।

সুদিন বুঝিল যে, নিশ্চয়ই বাঘ নিকটস্থ পাহাড়ের কোন গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে—নিশ্চয়ই এইখানে তাহার বাসা।

সে বহুক্ষণ সেইখানে বসিয়া কি করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল—অবশেষে মনে মনে কি একটা উপায় স্থির করিয়া সেদিনের মত গৃহের দিকে ফিরিয়া চলিল।

পরদিন প্রাতে সে একখানি কুঠার লইয়া আবার বাঘের সেই আড্ডায় আসিল। তৎপরে সে সেইস্থানে বাঘের খোঁয়াড় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল।

কাঠের অভাব ছিল না—সুদিন গাছ কাটিয়া বাঘ ধরিবার এক প্রকাণ্ড খোঁয়াড় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। অনেকেই জানেন, এই সকল খোঁয়াড়ের ভিতর দুটি করিয়া ঘর থাকে। ছোট ঘরের মধ্যে একটা ছাগল বাঁধিয়া দেওয়া হয়; ছাগলের চীৎকার শুনিয়া বাঘ আসিয়া ছাগলকে উদরস্থ করিবার জন্য খোঁয়াড়ের ভিতর প্রবেশ করে, অমনই সুকৌশলে যে দরজা উপর দিকে উন্মুক্ত থাকে, তাহা পড়িয়া যায়—বাঘ আর বাহির হইতে পারে না। তখন লোকজন আসিয়া বাঘকে মারিয়া ফেলে।

প্রায় সাত দিন পরিশ্রম করিয়া সুদিন তাহার সেই খোঁয়াড় প্রস্তুত করিল। সব ঠিক হইলে শেষের দিন একটা ছাগল লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ছাগল কিছুতেই খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিবে না—ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল।

সুদিন যেমন তাহাকে ঠেলিয়া ভিতরে দিতে যাইবে, অমনই সে দড়ী ছিঁড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে ছুটিয়া পলাইল। সুদিনও তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিবার জন্য উঠিল; কিন্তু সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল। সুদিন দেখিল, একটু দূরে ঝোপের মধ্যে বাঘ বসিয়া একদৃষ্টে তাহাকে

লক্ষ্য করিতেছে, লোলজিহ্বা সঞ্চালন করিতেছে এবং ঘন ঘন বৃহৎ লাঙ্গুল আন্দোলন করিতেছে।

সুদিনের বন্দুক হাতের নিকটে ছিল না। সে কখনও বাঘ মারে নাই বটে, কিন্তু বাঘের স্বভাব বেশ জানিত। ভাবিল, একটু নড়িলেই বাঘ তাহার উপরে লাফাইয়া পড়িবে।

কিন্তু এইরূপেই বা কতক্ষণ সে থাকিবে? নিশ্চয়ই বাঘ তাহাকে আক্রমণ করিবে। সে ভাবিল, যদি আমি ইহার দিকে তাড়া করিয়া যাই, তাহা হইলে এ-ভয়ে নিশ্চয়ই পলাইতে পারে। তাহাই সে কোমর হইতে তরবারি খুলিয়া লইয়া ব্যাঘ্রের দিকে চলিল।

কিন্তু সে একপদ অগ্রসর হইতে-না-হইতে বাঘ গর্জ্জন করিয়া, লম্ফ দিয়া তাহার স্কন্ধে পড়িল। সুদিন তাহার আক্রমণে ধরাশায়ী হইল। বাঘ সুদিনকে মুখে করিয়া মস্তক ও লাঙ্গুল আন্দোলন করিতে করিতে জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গেল।

রায়মতী সেদিন সমস্ত দিন স্বামীর জন্য ছট্‌ফট্‌ করিল। রাত্রি হইল, সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল—তবুও তাহার স্বামী ফিরিল না। সে তাহার চিন্তায় বড় অস্থির হইয়া উঠিল।

৩

পরদিন কন্যাকে পিঠে বাঁধিয়া রায়মতী স্বামীর সন্ধানে জঙ্গলের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় সুদিন বাঘের খোঁয়াড় প্রস্তুত করিতেছিল, তাহা সে তাহার নিকট শুনিয়াছিল—এক্ষণে সে সেইদিকে চলিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর সে অবশেষে খোঁয়াড়ের নিকট আসিল। সেখানে আসিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয় হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া গেল।

সে দেখিল, তাহার স্বামী নাই। তাহার তরবারি ঢাল সবই সেখানে পড়িয়া আছে—দূরে তাহার বন্দুক ও বারুদ গুলির থলিও রহিয়াছে।

ইহাতে রায়মতীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহার স্বামীর কি হইয়াছে।

কিন্তু সে জাতিতে দোষাদ—তাহাতে পাহাড়িয়া। স্বামীর জন্য সে কাঁদিল না, একবিন্দু জল তাহার চোখে দেখা গেল না। সে বাঘকে না মারিয়া গৃহে ফিরিবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। মনে মনে বলিল, বাঘকে মারিয়া সে স্বামীহত্যার প্রতিশোধ দিবে, নতুবা নিজে প্রাণে মরিবে।

রায়মতী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানে বসিয়া কি করিবে-না-করিবে, তাহাই স্থির করিল। তাহার পর সে তাহার স্বামীর বন্দুক তুলিয়া লইল। দেখিল, বন্দুক প্রস্তুত আছে। সে কতকগুলি তৃণ সংগ্রহ করিয়া খোঁয়াড়ের ভিতর একটি ক্ষুদ্র শয্যা রচনা করিল। তৎপরে সেই তৃণশয্যার উপর নিজের কন্যাকে শয়ন করাইয়া দিল। আজ খোঁয়াড়ে ছাগশিশুর পরিবর্ত্তে মানবশিশু স্থাপিত হইল।

কিন্তু ইহাতে রায়মতীর মনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না। সে ভাবিয়াছিল, মেয়েটিকে শোয়াইয়া দিলে সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিবে; তখন সেই শব্দ শুনিয়া নিশ্চয়ই বাঘ সেখানে আসিবে; কিন্তু মেয়েটা কাঁদে না।

রায়মতী কি উপায় করিবে, কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাই ভাবিল। তৎপরে সহসা তাহার একটা কথা মনে হইল, সে তখনই তাহাই করিতে ছুটিল। সে তাহার স্বামীর তরবারি লইয়া কতকগুলি কাঁটাগাছ কাটিল। তৎপরে মেয়েটিকে সরাইয়া যেখানে সে তৃণশয্যা পাতিয়াছিল, সেইখানে সেই কাঁটা-গাছগুলি বিছাইয়া দিল। তৎপরে সে ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া মেয়েটিকে সেই কাঁটার উপরে সশব্দে ফেলিয়া দিল। মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা বিঁধিল—সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার ক্রন্দনে সেই বিস্তৃত জঙ্গল পূর্ণ হইয়া গেল। রায়মতী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। একটা গাছের ডালে বন্দুক রাখিয়া দুই হাতে সেই ডাল চাপিয়া ধরিল।

তখন তাহার দুই চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বর্ষিতেছিল, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ঝকিতেছিল। জ্ঞান ছিল কিনা সে জানে না—তাহার কর্ণে তাহার কন্যার কাতর ক্রন্দন একবারও প্রবেশ করে নাই।

সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইল। তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। মনুষ্য-মাংসাশী ব্যাঘ্র মনুষ্যের চীৎকার ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঝোঁয়াড়ের নিকটবর্ত্তী হইল।

রায়মতীর সমস্ত শরীর যেন একমুহূর্ত্তে লৌহে গঠিত হইল। সে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বাঘের প্রতি পদক্ষেপ একদৃষ্টে লক্ষ্য করিতেছিল, তাহার চক্ষের তারা যেন তাহার চক্ষু হইতে ফাটিয়া বাহির হইতেছিল।

ক্রমে বাঘ খোঁয়াড়ের দ্বারস্থ হইল। রায়মতী বৃক্ষান্তরাল হইতে তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে বাম হস্তে সবলে বন্দুক ধরিল, দক্ষিণ হস্তে ঘোড়া টিপিল। ধপ্ করিয়া একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং বন্দুকের আওয়াজে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

৪

রায়মতীর গুলি বাঘের ঠিক্ বুকে গিয়া লাগিয়াছিল। সে বিকট চীৎকার করিয়া লম্ফ দিল, তৎপরে গড়াইয়া পড়িল, এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না।

রায়মতী কিয়ৎক্ষণ বৃক্ষান্তরালে অপেক্ষা করিল। তৎপরে যখন দেখিল, বাঘ আর নড়িতেছে না, তখন ধীরে ধীরে গিয়া তাহার কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল। সে অনেক কষ্টে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া চুপ করাইল।

রায়মতী গৃহের দিকে ফিরিতেছে—কিন্তু অদূরে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে বনানী ভরিয়া গিয়াছে। রায়মতী ভয় পাইল না, সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া অনেক দূরে গেল।

শব্দ আবার হইল। তখন সে বুঝিল, মানুষ—সম্মুখস্থ একটা গহ্বরের ভিতর হইতে কে গোঙাইতেছে। সে উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

উত্তর নাই। তখন রায়মতী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

এবার গর্ত্তের ভিতর হইতে একজন কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমি সুদিন, তুমি যেই হও, আমাকে এখান হইতে উঠাও। বাঘে আমায় ফেলে দেছে—দুদিন এখানে পড়ে আছি।"

রায়মতী আর যে তাহার স্বামীকে ফিরিয়া পাইবে, এমন আশা তাহার ছিল না। সে মহা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কন্যাকে গাছের তলায় নামাইয়া দিল। তৎপরে এক লম্ফে গহ্বরের ভিতর গিয়া পড়িল।

সুদিন আহত হইয়াছিল, মরে নাই। সে গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছিল—সেই পর্য্যন্ত তাহার ভাল জ্ঞান হয় নাই—কখন জ্ঞান হইয়াছে, আবার জ্ঞান গিয়াছে, তাহা সে জানে না। সহসা বন্দুকের আওয়াজে তাহার পূর্ব্বজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল।

নিশ্চয় নিকটে লোক আছে ভাবিয়া সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়াছিল—কিন্তু শরীর দুর্ব্বল, কণ্ঠ ক্ষীণ, স্বর অধিক উচ্চে উঠিতে পারে নাই।

রায়মতী জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপে তুমি এই গর্ত্তের ভিতরে পড়িলে?"

সুদিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বলিয়া বলিল, "বাঘ আমাকে মুখে করিয়া এইখানে আসিল; কিন্তু গর্ত্তের কাছে আসিয়া লাফাইবে বলিয়া সে যেমন আমাকে পিঠে উল্টাইয়া ফেলিবে, আমি বাঘের পিঠের উপর হইতে গড়াইয়া এই গর্ত্তে পড়িয়া গেলাম। পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া যাই। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে দেখিতে পাইলাম, বাঘটা গর্ত্তের উপরে গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছে।"

গর্ত্তটা পাহাড় প্রদেশে যেরূপ হয়, সেইরূপ। ইহার ভিতর দিয়া বর্ষার জল যায়। ইহা নর্দ্দমার মত অনেক দূর গিয়াছে; কিন্তু অত্যন্ত অপরিসর ও গভীর সেইজন্য বাঘ তন্মধ্যে আসিতে পারে নাই।

অনেক কষ্টে রায়মতী সুদিনকে উপরে তুলিল। বাঘ মরিয়াছে দেখিয়া সুদিনের সমস্ত যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল; সে যেন নবজীবন লাভ করিল। সে উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না—তথাপি তাহার নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল।

বাঘ কিরূপে মরিয়াছে, যখন সে শুনিল, তখন সে জগৎ-সংসার ভুলিয়া গেল। সে রায়মতীর স্কন্ধে দেহভার অর্পণ করিয়া গৃহের দিকে ফিরিল। যতক্ষণ এ কথা পরিচিত সকলকে না বলিতে পারিতেছে, ততক্ষণ সে কোন মতেই স্থির হইতে পারিবে না।

* * * *

সুদিন বাঘ মারার জন্য ২০০৲ টাকা সরকার হইতে পুরস্কার পাইল।

বড় সাহেব প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়াছিলেন। তিনি নিজের পকেট হইতে আরও ২০০৲ টাকা রায়মতীকে দিলেন।

এখন তাহাদের আর কোন দুঃখ কষ্ট নাই।

সম্পূর্ণ।